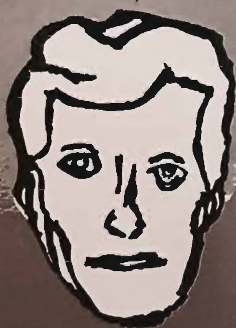
শতবর্ষের ফেরারি:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



আহমদ ছফা

শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আহমদ ছফা

প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী
শাহবাগ

প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী,১৯৯৭

প্রকাশক
ডঃ লেনিন আজাদ
প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী
৫৮, আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মাহবুব কামরান

কম্পোজ
উথানপর্ব কম্পিউটার
ইহা
৭১ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
নূর কার্ডবোর্ড অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
২৭৮/১ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন ॥ ঢাকা ১০০০

দাম
পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র
US $ 2

SHOTO BARSHER FERARI: BANKIM CHANDRA CHATTO PADDAYA By Ahmed Sofa. Published by Prychcha Vidya Prakashani, 85 Aziz Super Market, Shahbag, Dhaka 1ooo. Cover Designed by Mahabub Kamran. First published February 1997. Price: Tk. Forty Five Only.

উৎসর্গ

পরলোকগত বন্ধু—ভাই
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মুখবন্ধ

ছাত্র থাকার সময়ে আমি ইংরেজিতে লিটারারি আইডিয়েল অব বেঙ্গল শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখি। সেই রচনাটি বাংলা একাডেমীর ইংরেজি জার্নালে প্রকাশিতও হয়েছিলো। উনিশশো আটষট্টি উনসত্তুর সালের দিকে হবে। সেই সময়েই আমার প্রবন্ধের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অংশ লিখতে গিয়ে মনে স্বতঃই কতিপয় প্রশ্ন জেগেছিলো। তারপর থেকেই বঙ্কিম সম্পর্কে আমি সচেতনভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর লিখিত যতোগুলো গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা এবং জার্নালে প্রকাশিত রচনা আমার হাতে এসেছে, আগ্রহ সহকারে পাঠ করতে আরম্ভ করি। বঙ্কিম সম্পর্কে যে বিতর্ক দীর্ঘকাল থকে চলে আসছিলো, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারেননি। তারপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নের জটসমূহ যখন ক্রমবর্ধিত হারে জটিল আকার ধারণ করতে থাকে, বঙ্কিম সম্পর্কিত বিতর্কও নতুন নতুন মাত্রা অর্জন করতে থাকে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে বঙ্কিম সম্পর্কিত বিতর্ক যেখানে এসে থেমেছে, সেটাকে বিচার বলা বোধকরি সঙ্গত হবে না। একদল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথেরও ওপরে স্থান দিতে চান, অন্যদল তাঁকে একেবারে খারিজ করতে পারলে বেঁচে যান।

আমার এই রচনাটিতে পূর্বতন বিতর্কসমূহের যে ধারাবাহিকতা তার রেশ একেবারে অনুপস্থিত সে কথা আমি বলতে পারবো না। বরঞ্চ বলতে চাই বিতর্কটা চলে আসছিলো বলেই আমি রচনাটা লেখার দায়িত্ব স্বীকার করতে প্রলুব্ধ হয়েছি। এই রচনা আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা মহল বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থন অসমর্থন জানানোর জন্য লিখতে প্রবৃত্ত হইনি। বিগত পঁচিশ বছর সময়ের পরিধিতে যে সকল চিন্তা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছে, সেগুলো একটা সূত্রাকারে প্রকাশ করার জন্যই এ লেখা। অন্যান্য কাজের চাপের মধ্যে লেখার কাজটি করতে হয়েছিলো বলে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। আমার লেখাটিকে সঠিক অর্থে গবেষণা কর্ম বলা শোভন হবে না। আগামীতে যাঁরা গবেষণা করবেন, আমি আশা করি তাঁদের সামনে এই রচনাটি কতিপয় নতুন দিক উন্মোচন করবে এবং সেটাই হবে এই রচনার সার্থকতা।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ নূরুল আনোয়ার এবং স্নেহভাজন রতন বাঙালী (রত্নেশ্বর দেবনাথ) রচনাটি কম্পিউটারে টাইপ এবং সংশোধন করার সময়ে বিস্তর কষ্ট স্বীকার করেছে। প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনীর ডঃ লেনিন আজাদ আগ্রহী হয়ে লেখাটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

বিনীত

আহমদ ছফা
ইহা
৭১ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

এক

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত এই রচনাটি আমার নিজের জীবনকথা দিয়ে শুরু করতে হবে। স্কুলে থাকার সময়ে আমাদের ইংরেজি গ্রামার, ট্রানশ্লেসন এবং বাংলা গদ্য পদ্য পড়ানোর শিক্ষক শিববাবুর নেক নজরে পড়ে গিয়েছিলাম। তাঁর পুরো নাম শ্রীশিবপ্রসাদ সেন। সোজা হয়ে হাঁটতেন। মাথার সবগুলো চুল পাকনা, তবে মাঝে মাঝে কালোর আভাস পাওয়া যেতো। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই কাঁধের ওপর একটা ভাজ করা সুতীর চাদর ঝুলিয়ে রাখতেন। সামনের দিকের দুটো ছাড়া সবগুলো দাঁত পড়ে গিয়েছিলো। দেখলে মনে হতো ঈষৎ লালচে দাঁত দুটো চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

শিববাবুর সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী চালু ছিলো। সেগুলো একেকটা একেক রকম। আমার ত্রিশ বছর আগে যাঁরা এই স্কুলে পড়েছেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, তাঁরাও ছাত্র থাকার সময়ে শিববাবুকে এই একই রকম কাচা পাকা দেখতে পেয়েছিলেন। এখন সাদার আভাস বেশি, তখন কাচার প্রতাপ ছিলো অধিক। এটুকু ছাড়া আদলে অবয়বে শিববাবুর মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোনো পরিবর্তন খুজে পেতেন না। এই রকম মানুষের বয়স কতো হবে জানতে চাওয়া অবান্তর। যাঁদের সম্পর্কে বলা যায়– বয়সের কোনো গাছ পাথর নেই, সত্যিকার অর্থে শিববাবু ছিলেন সে ধরনের মানুষ।

শিববাবুর বিরাগভাজন অথবা প্রিয় হওয়া কোনোটাই ক্লাশের ছাত্রদের কাছে সুখকর ব্যাপার ছিলো না। যে সমস্ত ছাত্র টেন্স, ভার্ব এবং ইংলিশ শব্দের বানান উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারতো না, তাদের লিকলিকে বেত দিয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে তিনি পেটাতেন। আর অঘা মার্কা ছাত্রদের হাই বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সমস্ত ক্লাশের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করতেন। শিববাবু এদের বলতেন ইণ্ডিয়া কোম্পানির পিলার।

যে সমস্ত ছাত্র শিববাবুর প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারতো, তাদের জন্যও ভিন্ন রকমের শাস্তি অপেক্ষা করে থাকতো। শিববাবু তাদের কানের গোড়া আস্তে আস্তে মলে দিতেন এবং আদর করে সম্বোধন করতেন শ্যালক। আমার মুখস্ত করার অনেক ক্ষমতা ছিলো। সুতরাং অনায়াসে শিববাবুর শ্যালক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতে পেরেছিলাম। শিববাবুর শ্যালক হওয়া যেমন তেমন ব্যাপার ছিলো না। তাঁর দাবির পরিমাণ ছিলো অসম্ভব রকম চড়া। মেটাতে গিয়ে জান কাবার হওয়ার দশা।

শিববাবু আমার কাছে স্কুল লাইব্রেরির সমস্ত চাবি গছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যদি হারাস এক কিলে আস্ত মাথা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো। আমার এই নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে সতীর্থ ছাত্ররা ঈর্ষা করতো। কিন্তু আমাকে মস্তকটা স্কন্ধদেশের ওপর খাড়া রাখার জন্য

সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হতো। চাবি রক্ষক পদ গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আমার নাকের পানি চোখের পানি এক হওয়ার জোগাড়।

শিববাবু স্কুল লাইব্রেরির আলমারির গহ্বর থেকে মোটা মোটা শক্ত মলাটের বই বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলতেন, পনেরো দিনের মধ্যে সবটা পড়ে ফেলবি। নইলে কিলিয়ে হাড্ডি গুড়ো করে ফেলবো। এই শক্ত মলাটের বইগুলোর কোনোটা ছিলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের, কোনোটা নবীনচন্দ্র সেনের, কোনোটা হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী। ওই এতোটুকু বয়সে আমাকে কায়কোবাদের মহাশ্মশান, অশ্রুমালা, অমিয়ধারা, শিবমঙ্গল এই সকল কাব্যগ্রন্থে দাঁত বসাতে হয়েছিলো। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এরকম কতো লেখকের বই যে আমাকে চাবি রক্ষকের পদগৌরবের ইজ্জত রক্ষার জন্য পাঠ করতে হয়েছিলো, তার অনেকগুলোর নামও এখন উলেখ করতে পারবো না। এই সমস্ত অপাচ্য এবং দুষ্পাচ্য জিনিশ ভক্ষণ করার কারণে আমার মানসিক হজম শক্তির প্রক্রিয়া গড়বড় হয়ে পড়েছিলো এবং আমি এক রকম এচঁড়ে পেকে গিয়েছিলাম। এই সমস্ত মহাজনের মহত প্রভাবে আমার মনের বায়ুমণ্ডল এতোটা কুপিত হয়ে উঠেছিলো, একান্ত সরল প্রশ্নের সরল জবাবও আমার পক্ষে এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো। অনেক লম্বা কাহিনী। সে সমস্ত কথা থাকুক।

এক সময় শিববাবু বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এইবার পড়বি সাহিত্য সম্রাটের রচনা। বঙ্কিম রচনাবলী পাঠ করতে গিয়ে আমি যে প্রাথমিক হোঁচটটি খাই সেই অভিজ্ঞতার বয়ানটুকু দিয়ে আমার বঙ্কিমচন্দ্রের পুনঃমূল্যায়ন সম্পর্কিত রচনাটির সূত্রপাত ঘটাচ্ছি।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সীতারাম, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ এই সকল উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে আমি একটা অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এই সকল উপন্যাসের যে সকল জায়গায় মুসলমান সম্পর্কে লেখক নিষ্ঠুর এবং অকরুণ মন্তব্য করেছেন, সে সমস্ত জায়গায় পুস্তকের মার্জিনে শালা বঙ্কিম, মালাউন বঙ্কিম এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অযোগ্য এমন সব গালাগাল লিখে রেখেছে, দেখে আমার কান গরম হয়ে গেলো। এই জিনিশটি সেই বয়সেও আমাকে ভীষণ রকম ধাক্কা দিয়েছিলো।

বাংলাদেশের যে অঞ্চলটিতে আমার জন্ম, সেখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা ছিলো না। যে কারণে হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য ঘটে থাকে, একই কারণে হিন্দুতে মুসলমানেও বিরোধ ঘটতো। বোধকরি তার একটা বড়ো কারণ এই যে আমাদের অঞ্চলে হিন্দু কিংবা মুসলমান কোনো বড়ো জমিদারের অস্তিত্ব ছিলো না। পরিবেশের প্রভাবে মুসলমান ছাত্ররা বঙ্কিমের বইয়ের মার্জিনে এতো সমস্ত খারাপ কথা লিখে রেখেছে একথাও আমার মন বিশ্বাস করতে চায়নি। নিজেকেই আমি বার বার জিগগেস করেছি, কোনো রকমের উস্কানি ছাড়াই মুসলমান ছাত্ররা এতোসব অশ্লীল মন্তব্য লিখে রাখলো কেনো? আমার বয়স যতো বেড়েছে, এই ব্যাপারটি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বারংবার খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। সহজাত সাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রকাশ ঘটাবার জন্যই শুধু আমাদের স্কুলের ছাত্ররা বঙ্কিমের ওপর মানসিক প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে বাপান্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই জিনিশটি আমি পুরো সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিলো আরো একটা বড়ো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে। আমি দুর্বল মস্তিষ্কের কারণে সেটা খুঁজে বের করতে পারছিনে।

স্কুল থেকে সরাসরি ক্লাশ টপকে টপকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিনি। মাঝখানে অনেকগুলি বছর অন্য কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে বঙ্কিম সাহিত্য পড়তে গিয়ে আমাকে স্কুলের মতো একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে বঙ্কিমের লেখা বইগুলো ধার করে এনে পড়তে গিয়ে দেখি মার্জিনে একই ধরনের মন্তব্য লিখে রাখা হয়েছে, তবে তফাৎ একটা অবশ্যই আছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা যে সকল কথা লিখেছিলো সেগুলো অশ্লীল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মন্তব্যগুলো অশোভন।

যদিও এই জিনিশটি আমাকে একটা ভীষণ রকম নাড়া দিয়েছিলো, এ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে মতামত বিনিময় করিনি। বছর তিনেক আগে উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

একটি রচনা পাঠ করার পর আমার চমক ভাঙে। শরৎচন্দ্র মুসলমান ছাত্রদের সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে জোড়হাত করে একটি আবেদন রাখছেন। বাবারা বঙ্কিমের বইয়ের পাতায় তোমরা যেভাবে 'শালা বঙ্কিম' ওজাতীয় কথা লিখে রাখো, দোহাই বাবারা আমার বইতে সে রকম কিছু যেনো না লিখো, কথাগুলো অবশ্য আমার নিজের জবানিতেই বললাম। তারপর থেকে আমার মনে একটা ধারণা গাঢ়মূল হয়েছে যে মুসলমান ছাত্ররা বঙ্কিমের বিশেষ বিশেষ বই পাঠ করা মাত্রই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আজে বাজে কথা লিখে রাখে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। বিষয়টা গোপন একটা ব্যাধির মতো নীরবে এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন সহৃদয় কথা সাহিত্যিকেরও দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিক্রিয়ার কথা শুধু বয়ান করলাম। বয়স্ক মুসলমান পাঠকদের মর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রচনা কি রকম অক্রোশের জন্ম দিয়েছিলো, এই রচনায় একটা পর্যায়ে সেটা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হবে।

কথা হলো, মুসলমান ছাত্রদের একটা অংশ বঙ্কিমের বইয়ের পাতায় অশোভন মন্তব্য লিখে রাখে কেনো? বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক লেখক সেটাই কি তার একমাত্র কারণ? তিনি যদি সাম্প্রদায়িক লেখক হয়েও থাকেন, তার মাত্রা এবং ধরনটা কি রকম। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে সাহিত্য রচনা করা হলে, সেটা অপর সম্প্রদায়ের মানুষের গাত্র দাহের কারণ হবে, সেটাও সমর্থনযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না। মাইকেল এবং বিদ্যাসাগর ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর ছোট বড়ো লেখকের বেশিরভাগই ছিলেন সাম্প্রদায়িক। এই অর্থে সাম্প্রদায়িক যে উনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটাই ছিলো হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ কেন্দ্রিক। মুসলিম সমাজের উপস্থিতি সেখানে একবারেই ক্ষীণ, নেই বললেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতের বলয় থেকে সে সকল চিন্তা ভাবনা বিকশিত হয়ে গতিশীলতা অর্জন করেছে, তার সবগুলো নঞর্থক ধরে নিয়ে নাকচ করারও উপায় নেই। যদি তাই হয় বাঙালি জাতির মনন এবং চিন্তা চর্চার বিকাশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তরকেই অস্বীকার করা হয়। অতীতের প্রতি অবিচার করে কেউ কখনো সুস্থ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না।

বঙ্কিম ছাড়া আরো অনেক সাম্প্রদায়িক লেখকের রচনা আমি পাঠ করেছি। তাঁদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। যেহেতু হিন্দুদের মধ্যে লেখালেখির চলটা বেশি ছিলো, তাই তাঁদের সংখ্যা অধিক হবে সেটা এক রকম নিশ্চিত। বঙ্কিম রচনা পাঠ করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান পাঠকেরা যে ধরনের আজে বাজে কথা লিখে রাখে, অন্য সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকের বেলায় সেটা অতো ক্রুদ্ধভাবে প্রকাশ পায় না কেনো? এই বিষয়টি আমাকে ভাবিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন এই মতের সমর্থক অনেক লেখকের রচনা আমি পাঠ করেছি। এই মতের অনুসারীদের একাংশ হিন্দু লেখক।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যিকারভাবে একজন অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লেখক এই মতাবলম্বী অনেক লেখকের রচনাও আমাকে পড়তে হয়েছে। এই মতের সমর্থকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আবার মুসলমান। এই দুই পরস্পর বিরোধী মতের বাইরে তৃতীয় মতের লেখক যাঁরা বঙ্কিমকে একটা নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিচার করেছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বঙ্কিম তাঁর সময়ের সন্তান এবং গোটা সময়টাই ছিলো সাম্প্রদায়িকতার রঙে অনুরঞ্জিত। বঙ্কিমের পক্ষে তাঁর যুগের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তাই তাঁর কোনো কোনো রচনায় অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রখররূপ ধারণ করতে পেরেছে। এটা বঙ্কিম মানসের মাত্র একটা দিক, কিন্তু বিজ্ঞাননিষ্ঠ, আধুনিক উদার মতাবলম্বী বঙ্কিমের রচনাসমূহ ধর্তব্যের মধ্যে না এনে গ্রহণ লাগা দিকটা বড়ো করে দেখলে আমরা বঙ্কিমের ওপর যেমন অবিচার করবো, তেমনটি অবিচার করবো নিজেদের বিচার বুদ্ধির। আবেগের ভাববাষ্প বর্জিত এই ধরনের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রয়াসী বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাও আমি কম পড়িনি।

বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে এই যে নানা মুনির নানা মত, তাঁদের মধ্যে কে বা কারা সঠিক, কারা ভ্রান্ত সে বিচারেও আমি প্রবৃত্ত হবো না। গায়ে মশা বসে কামড় দিলে যেমন হাত আপনি চালিত হয়ে মশাটিকে পিশে ফেলে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান পাঠকদের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে বহুকাল পূর্বে স্বর্গগত বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে কুৎসিত গালাগাল বর্ষণ করে বসে কেনো? তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ কি? সে জিনিশটিই বর্তমান রচনার অনুধাবনের বিষয়বস্তু।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক যুগের গোটা বাঙালি সমাজে এরকম ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেনেনি। বঙ্কিমের প্রভাব বাঙালি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে এতোদূর প্রভাব বিস্তারী হতে পেরেছে, অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর তুলনা চলতে পারে না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে তাঁর চরিত্রের কোন্ বিশেষ গুণটির জন্য তিনি বাঙালির একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষ ছিলেন একজন, কিন্তু পরিচয় অনেকগুলো। কোনো পরিচয় হেলাফেলা করার মতো নয়। প্রায় সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। যুগান্তকারী সাহিত্য স্রষ্টা, আধুনিক বাংলা উপন্যাস শিল্পের জনয়িতা বঙ্কিম, সত্যদ্রষ্টা যুগন্ধর পুরুষ ঋষি বঙ্কিম, অসাধারণ মনস্বীতাসম্পন্ন আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার অনুসারী বঙ্কিম, পুরাতাত্ত্বিক বঙ্কিম: এই এক মানুষের ভেতর এতোগুলো বৈশিষ্ট্য একটা আরেকটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই গুণগুলো তাঁকে তাঁর যুগের অন্যান্যদের চাইতে বিশিষ্ট এবং আলাদা করেছে; একথা সত্য বটে। কিন্তু সেগুলো তাঁর বাঙালি সমাজে অমোঘ ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হওয়ার কারণ বলে মান্য করা যায় না।

আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক আশ্চর্য সময়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে বহুমুখী জাগরণের সূত্রপাত হয় সেটাকে রেনেসাঁ না বললেও গুরুত্ব কোনো মতেই খাটো করে দেখা যাবে না। শিল্প, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যে সকল জিগগাসা উনবিংশ শতাব্দীর মন মানসে আলোড়নের সঞ্চার করেছিলো সেগুলোই বাঙালি সমাজকে আবেগ এবং গতি দান করে সমাজের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের মধ্যখানে একটি বিভাজন রেখা অবশ্যই স্থির করে নিতে হবে। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে বাঙালি সমাজ যে বিশেষ ধারাটি অনুসরণ করে বিকশিত হয়ে আসছিলো, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা গেলো সেটি একটি নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করেছে। এই নতুন ধারাটিকে অনেক অনেক সমাজ বিজ্ঞানী বেঙ্গল রেনেসাঁ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়ে আসছিলেন, যদিও পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের বেশিরভাগ সেটাকে একটা অতিকথার অধিক গুরুত্ব দিতে রাজি নন।

উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান রামমোহন একটি নতুন ধরনের একটি ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্ম সম্ভাবিত করে নিষ্ক্রিয় থাকেননি, সমাজ সংস্কারের ভূমিকায়ও তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন সাহিত্য চিন্তায় তাড়িত হয়ে ইউরোপে মহাকাব্য লেখার যুগ অবসিত হওয়ার পরও বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করতে প্রয়াসী হয়ে উঠলেন। অক্ষয় দত্ত এবং তাঁর মতো আরো কিছু নিবেদিত প্রাণ মানুষ বিজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত হয়ে জীবন এবং জগতের নানান জিগগাসাকে নতুনভাবে ঝালাই করে নিচ্ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বতোমুখী পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করেছিলো, যা ছিলো সমাজের একটি সীমিত অংশের সর্বব্যাপ্ত লক্ষণ। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বের তীব্রতা এতোদূর বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে সমাজের একেবারে রক্ষণশীল অংশও নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেননি। এই রক্ষণশীল অংশ একজন রাজা রাধাকান্ত দেবকে শুধু সমাজপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি; এই ধারাটি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদের মতো একজন উজ্জ্বল চরিত্রের সাধকের জন্মও সম্ভাবিত করে তুলেছে।

প্লেখানভ প্রতিভার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সামাজীকিকরণের ক্ষমতাই হলো প্রতিভা। প্রতিভা বলতে যে অলোকসামান্যতার ধারণা আমাদের মনে উদয় হয়, সেই সংজ্ঞায় তার হয়তো সবটুকু স্থান করে নিতে পারেনি, তবু এটাকে প্রতিভার একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হিসাবে মান্য করতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকী বাঙালি সমাজের জাগ্রত জিগগাসাসমূহের অনেকগুলোই ধারণ করেছিলেন। সেসকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য উনবিংশ শতাব্দীর সন্তানদের অমরতার বসনে আবৃত করেছিলো, বঙ্কিম সেরকম গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধীকারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

তাঁর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের কিছু ছিলো, বিদ্যাসাগরেরও কিছু ছিলো। রাজা রামমোহন রায়ের মতো সমাজে তিনিও একটা নায়কসুলভ আসন অধিকার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষা চর্চার যোগ্য উত্তরসুরীর ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে নতুন সাহিত্য চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, বঙ্কিম তাতে অনেকখানি অগ্রসরমানতা দিতে পেরেছিলেন। অক্ষয় দত্ত প্রমুখ বিজ্ঞান কর্মীদের মনে যে বিজ্ঞান চিন্তা ঝিলিক দিচ্ছিলো, সে বস্তু জিগগাসাও অল্প স্বল্প পরিমাণে বঙ্কিমের অভিনিবেশের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পেরেছিলো। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধক সুলভ তন্ময়তা, তাঁর মানসপরিমণ্ডলে একটা কুহেলিকা এঁকে দিয়েছিলো। কিন্তু বঙ্কিমকে যে জিনিশটি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যবিধ মনীষীদের চাইতে আলাদা এবং স্বতন্ত্র করে বাংলা তথা আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রগুরু হিসেবে ইতিহাসের পাদপীঠে স্থাপন করেছে, সেটি হলো বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা।

চার

মানুষের যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে রাষ্ট্রই হলো সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্যবিধ মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষের কথা চিন্তাও করা যায় না। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের মতে মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব। এখানে গ্রীক পণ্ডিত সমাজকে রাষ্ট্র অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ রাষ্ট্রে বাস করবে না, সে হয়তো অমানুষ, নয়তো অতি মানুষ। আরব দার্শনিক ইবনে খলদুন রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনীয় বস্তু বলে অভিহিত করেছেন। দার্শনিক হেগেল মন্তব্য করেছেন, জনসমাজ যখন রাষ্ট্রীয় সমাজে রূপান্তরিত হয়, তখনই সে সাবালকত্ব অর্জন করে এবং বিশ্ব সমাজের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙালি হিন্দু সমাজের অগ্রসর অংশ ইউরোপীয় চিন্তার সংস্পর্শে এসে অনেক নতুন ভাবধারা, অনেক নতুন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপলব্ধি আয়ত্ব করতে শিখেছিলো। এই নতুন ভাবনা চিন্তার অভিঘাতে তৎকালীন সমাজ শরীরে একটি সংঘাতও আসন্ন হয়ে উঠেছিলো, একথা সত্যি বটে। কিন্তু রাষ্ট্র যে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণের নিয়ন্তা সে জিনিশটি উনবিংশ শতাব্দীর কোনো কৃতবিদ্য ব্যক্তির মানস ফুঁড়ে জন্মাতে পারেনি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন ব্যতিক্রম। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনয়িতা হিসেবে বঙ্কিমের যে পরিচয়, সেই জিনিশটি অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর অন্যবিধ কীতির বলয় ভেদ করে আসল স্বরূপে শনাক্ত হতে পারেনি।

বঙ্কিম অনেক কিছুই ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি যে কর্ম হাতে তুলে নিয়েছেন তাতেই সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেক সময় এমন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে সম্রাট পরিচয়ের অন্তরালে অন্যবিধ প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ঢাকা পড়ে গেছে। বাঙালি সমাজে বঙ্কিম মুখ্যতঃ সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এটা আক্ষরিক অর্থে সত্য এবং এতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কথা হলো, সাহিত্য স্রষ্টার পরিচয়টি প্রধান বলে কবুল করে নিলে, বঙ্কিম যে কারণে বাঙালি সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছেন তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না। এখানেই একটি প্রশ্ন অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে। বঙ্কিম তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্র চিন্তার বীজটি চারিয়ে তুলেছিলেন। সাহিত্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক ধারণার প্রকাশ ঘটানো বাংলা সাহিত্যের নিরিখে এটা একটা অভিনব কৌশল। কিন্তু ইউরোপে এই কৌশল বহু পূর্বে থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। ভোলতেয়ার, রুশো,

দিদেরোসহ ফরাসী এনসাইক্লোপিডিক আন্দোলনের তুখোর বুদ্ধিজীবীরা এই পদ্ধতি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করে আসছিলেন। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে সেই টেকনিকটি নতুন করে প্রবর্তন করেছিলেন।

বঙ্কিম আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম সার্থক স্থপতি। বঙ্কিমের মতো বাকসিদ্ধ এবং বাকসংযম লেখক বাংলা সাহিত্যে আর জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ এতো প্রবল ছিলো যে একটি মাত্র ভ্রূকুটি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মতের একটি জনসভা স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। যে বিমূর্ত ভাবনা বঙ্কিম একটি বাক্যে প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো অমন সূক্ষ্মদর্শী মানুষের পক্ষেও ওই একই ভাবনা প্রকাশ করার জন্যে অনধিক এক পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হতো। এ হলো বিষয়ের ওপর বঙ্কিমের যে অধিকার তথা অথরিটি তার প্রমাণ। তথাপি একথা সত্যি যে এই দেবদুর্লভ আশ্চর্য শিল্পপ্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাঙালি সমাজের বিধাতা পুরুষে রূপান্তরিত করেনি। যতোই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন না কেনো, শুধুমাত্র লেখক পরিচয়ের ওপর যদি বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা হতো, তাঁকেও অন্য দশজন ক্ষণজন্মা লেখকের ভাগ্য বরণ করে নিতে হতো। একজন লেখক কিংবা কবি তাঁর সমাজে এবং সময়ে যে প্রভাবই বিস্তার করুন না কেনো, পরবর্তী প্রজন্মসমূহ সাহিত্যের ইতিহাসের অংশ হিসেবেই তাঁর বিচার এবং মূল্যায়ন করতো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন ক্ষমতাবান লেখকের চাইতে অধিক কিছু ছিলেন এবং সেই বিষয়টিই বর্তমান পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

বঙ্কিম ছিলেন আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবেত্তা। তিনিই সর্বপ্রথম একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্কিম ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতিচিন্তা, ইতিহাসচিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা এবং সাহিত্যচিন্তা সব ধরনের চিন্তাপ্রবাহের গতিমুখ রাষ্ট্র চিন্তার মূল বিন্দুকে ঘিরে বিকশিত করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাই তাঁর মুখ্য মনোযোগের বিষয়। অন্যবিধ চিন্তাসমূহকে রাষ্ট্র চিন্তার সহায়ক চিন্তা হিসেবে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ছিলো একমুখী মন। যাই লিখুন না কেনো একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর মনে কম্পাসের কাঁটার মতো হেলে থাকতো। তিনি তাঁর সমস্ত কল্পনাশক্তিকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কামানের গোলার মতো ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমের সাহিত্য এবং অন্যবিধ সৃষ্টিকর্মের মধ্যে থেকে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে আলাদাভাবে বিশ্লিষ্ট করা হলে বঙ্কিম মনীষার আসল স্বরূপটি জানা যেমন সহজ হবে, তেমনি তাঁর স্ববিরোধিতাসমূহও খুব সহজে শনাক্ত করা যাবে। বাঙালি সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সর্বাধিক ক্রিয়াশীল হতে পেরেছে, তার মুখ্য কারণ বঙ্কিম রচিত সাহিত্য গ্রন্থের অনন্যতা নয়, বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা। মনে রাখতে হবে বঙ্কিমের মৃত্যুর প্রায় সত্তুর বছর পরে তাঁর রচিত 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলং বন্দে মাতরম' গানটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলো। এই গানটি বঙ্কিম স্বতন্ত্রভাবে আনন্দমঠ লেখার বছর তিনেক আগে রচনা করেছিলেন এবং পরে

আনন্দমঠ পুস্তকের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের উন্মেষপর্বে বঙ্কিমের চিন্তা এমন একটা গভীর মর্মবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো, অনুশীলন এবং যুগান্তর দু'টি সন্ত্রাসপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা এবং কর্মীরা বঙ্কিমকে তাঁদের গুরু এবং আনন্দমঠ গ্রন্থটিকে প্রেরণাপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সংস্কৃতি চেতনার দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে অগ্রসর হিন্দু সমাজের স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুণ বিপ্লবীরা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মরণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই জিনিশটি বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন একটি বিদারণ রেখা এমনভাবে বিঁধিয়ে দিতে পেরেছিলো যা আখেরে বাংলা তথা ভারতের খণ্ডিতকরণের বেলায় একটা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ বিভাগ করার জন্য কোনো একজন ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তিনি অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন, বাংলা এবং ভারত বিভাজনের মাল মসলাসমূহ এই দেশীয় সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে অনুকূল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করেছিলো। ইতিহাসের চোরাগোপ্তা স্রোতসমূহ বঙ্কিম মানসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁকে দিয়ে ইতিহাসের ধাত্রীর ভূমিকা পালন করিয়ে নিয়েছিলো। বঙ্কিম ইতিহাসের যন্ত্রের কাজটিই করেছিলেন।

বঙ্কিম সম্পর্কিত এই রচনাটিতে সেই সুবিস্তৃত পেক্ষাপট স্পর্শ করার অবকাশ নেই এবং আমার বঙ্কিম সম্পর্কিত মতামত বয়ান করার জন্য তাঁর প্রয়োজন আছে, তাও মনে করিনে। আমি এই রচনাটিতে যে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছি তার সমর্থনে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সকলের সামনে তুলে ধরবো। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা যে আবেগ এবং অনুরাগ সহকারে আনন্দমঠের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতেন, এই নব্বুইয়ের দশকেও দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা একই আবেগ অনুরাগ নিয়ে বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। মাত্র তিনবার বছর আগে প্রয়াত সাংবাদিক গিরিলাল জৈনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছড়ানো ছিটানো রচনাগুলো গ্রথিত করে একটি গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম দ্যা হিন্দু ফিনোমেনন (The Hindu Phenomenon) উগ্র মৌলবাদী হিন্দুদের কাছে এই পুস্তকটি কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এক বছরের মধ্যে চারটে সংস্করণের নিঃশেষিত হওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। উত্তর ভারতে হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে গিরিলাল জৈনের এই গ্রন্থটি অনেকটা ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত নানা রচনার মধ্য দিয়ে প্রয়াত লেখক একটি বিশেষ মতামতকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের আত্মবিস্মৃত হিন্দুরা হিন্দুসত্তা তথা ভারতীয় সত্তা ফিরে পেতে আরম্ভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে তার সূচনা এবং বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে হিন্দুসত্তা চূড়ান্ত সার্থকতার সাথে বিরাট একটা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পেরেছে। একটি হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন নির্মাণ করে ভারতীয় হিন্দুদের যথার্থ পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন বঙ্কিম। দেখা

যাচ্ছে, আজকের ভারতবর্ষেও বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা অসম্ভব রকম জীবন্ত। ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষেও বঙ্কিমের চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই রচনার মধ্যবর্তী অংশে বঙ্কিমের সাহিত্যভাবনার সঙ্গে ভাবনা কিভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে, সে ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। আমার ধারণা এই অনুসন্ধানের ভেতর থেকেই মুসলমান সমাজের একটা বিরাট অংশের মধ্যে যে একটা অন্ধ বঙ্কিম বিদ্বেষ রয়েছে এবং বঙ্কিম রচিত সাহিত্যের প্রতি তাঁরা নানা সময়ে যে অশোভন এবং অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন, তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে।

পাঁচ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি? কেউ বলবেন কৃষ্ণকান্তের উইল, কেউ বিষবৃক্ষ, আবার অন্য কেউ রাজসিংহ। আমি বলবো চন্দ্রশেখর। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের শিল্পোৎকর্ষের জন্য বাঙালি সমাজের দেবতা হয়ে উঠেননি। দেবী চৌধুরানী এবং আনন্দমঠ রচনা দু'টি লিখেই বঙ্কিম বাঙালি সমাজের মর্মমূল আকর্ষণ করে টান দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের রাজনৈতিক ধারণা এই দু'টি উপন্যাসে কেলাসিত হয়ে একটা আকার লাভ করেছিলো। একটি হিন্দু রাষ্ট্রের জন্ম কি করে সম্ভাবিত করা যায়? কারা কোন্ প্রক্রিয়ার এই হিন্দু রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করবে, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিক শুদ্ধতা এবং শারীরিক যোগ্যতা কি ধরনের হবে, বঙ্কিম মোটামুটি তার একটা ছক এই গ্রন্থে হাজির করার প্রয়াস পেয়েছেন। মূলতঃ দেবী চৌধুরানী এবং আনন্দমঠ উপন্যাস দু'টি একটা আরেকটার পরিপূরক। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসটি পড়ে পাঠকের মনে হবে বাঙালি হিন্দুর ক্ষাত্রশক্তির গরিমা তুলে ধরার জন্যই এই উপন্যাসটি রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উপন্যাসে বর্ণিত দেবী চৌধুরানী এবং ভবানী পাঠকের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিলো। বঙ্কিম সেই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো তাঁর নিজের আদর্শে ঢালাই করে উপন্যাসে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। যদিও দেবী চৌধুরানী কল্পিত কোনো চরিত্র নয়। বঙ্কিম দেবী চৌধুরানীকে যেভাবে সাধারণ লাঞ্ছিতা গৃহবধু থেকে রানীতে পরিণত করেছেন, সেই পদ্ধতিটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। একেবারে অতিসাধারণ গৃহবধুও জপ, তপ, ব্রত ও আচার পালন করে অনুশীলনের মাধ্যমে রানীর ভূমিকা পালন করতে পারে, সেটি দেখানোই ছিলো বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। দেবী চৌধুরানীকে শেষ পর্যন্ত সতীনের সঙ্গে ঘর করতে স্বামীর বাড়ি পাঠাতে বাধ্য হলেন, কারণ বঙ্কিম হিন্দু নারীর পতিভক্তির আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। পতিই শেষ পর্যন্ত হিন্দু নারীর পরম গতি।

আনন্দমঠ উপন্যাসটিকে দেবী চৌধুরানীর অপর প্রান্ত বললে অধিক বলা হবে না। দেবী চৌধুরানীতে ক্ষাত্র শক্তির যে প্রকাশ ঘটেছে জপ, তপ, ব্রতপালন এবং ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে অসাধ্য সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, তার একটি নমুনা তুলে ধরেছেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে তাঁর এই উপলব্ধিসমূহ অধিকতরো সংহত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মৌল উপাদানের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। দেবী চৌধুরানীতে যে চিন্তাটি স্ফুলিঙ্গ আকারে নির্গত হয়েছে, আনন্দমঠে দেখা যাবে সেটা একটা অগ্নিগিরিতে পরিণত হয়েছে। দেবী চৌধুরানীতে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে যেটা ছিলো চোরাগোপ্তা

হামলা, আনন্দমঠে সেই জিনিশটি পুরো দস্তুর সম্মুখ সমরের রূপ নিয়েছে। আরো দেখা যাবে দেবী চৌধুরানীর ভবানী পাঠক আনন্দমঠে সত্যানন্দ নাম গ্রহণ করেছেন। চরিত্র দু'টির গড়ন ভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠবে, দেবী চৌধুরানীর ভবানী পাঠক এবং আনন্দমঠের সত্যানন্দ একই ধাতুতে গড়া। দু'জন একই ব্যক্তি, শুধু নাম আলাদা।

নবাবী শাসনের অবসানে এবং বৃটিশ শাসন কায়েম হওয়ার প্রাক্‌কালে বাংলাদেশে দস্যুরা প্রায় সর্বত্রই প্রতাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। দস্যুবৃত্তিকে অপরাধ বলেও গণ্য করা হতো না। বাংলার অনেক জমিদারের পূর্বপুরুষেরা পেশাগতভাবে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতো। এই দস্যুদের সাথে ইংরেজের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘাত হরহামেশাই ঘটতো। এগুলো নতুন কথা নয়। পেশাদার দস্যু ছাড়াও ফকির এবং সন্ন্রাসীরা দলবদ্ধভাবে অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াতো। তাঁদের সঙ্গে ইংরেজের পুলিশ এবং সৈন্যের বার বার সংঘাত হয়েছে। দেবী চৌধুরানীর ঘটনা তার একটা। ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে সন্ন্রাসীরা ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এটা কোনো কবি কল্পনা নয়, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্কিম দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের বাস্তব পটভূমিটি এক রকম বদলে ফেলে উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন।

সন্ন্রাসীদের মতো এক রকম ফকিরেরাও বারংবার ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ফকির মজনু শাহ এবং তাঁর পালক পুত্র চেরাগ আলি ছিলেন ফকিরদের নেতা। সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাবটি ছিলো চমৎকার। কোনো কোনো সময়ে সন্ন্যাসী এবং ফকিরেরা মিলিতভাবে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তার ভূরি ভূরি লিখিত প্রমাণ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেটি করলেন, ফকিরদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে ছেটে বাদ দিয়ে সন্ন্যাসীদের লড়াইকে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু করলেন। সত্যানন্দকে বীরের গৌরব দিলেন, কিন্তু মজনু শাহ্‌র নামটি উল্লেখ করার উদারতা পর্যন্ত দেখাতে পারলেন না। বঙ্কিম তো আসল ঘটনা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ– তিনি বাস্তবতাকে খুন করেছেন। হ্যাঁ, কথা উঠতে পারে বঙ্কিম ইতিহাস রচনা করেননি। উপন্যাস লিখেছেন, প্রকৃত ঘটনাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিজের মনোমত করে ঢালাই করার অধিকার আছে। বঙ্কিমকে নিছক উপন্যাস লেখক হিসেবে ধরে নিলে তাঁর ওপর এই পর্যালোচনাটি তৈরি করবারও প্রয়োজন দেখা দিতো না। বঙ্কিম তাঁর এই দু'টি উপন্যাসে এমন একটি ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন, বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। হিন্দু–মুসলমানের সম্মিলিত লড়াইকে একক হিন্দুর লড়াই দেখাতে গিয়ে ইতিহাসের এমন একটা বিকলাঙ্গ অগ্রগতির খাত খনন করেছেন, যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসকে একটা কানা গলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে, তার প্রভাব এতো সুদূরপ্রসারী হয়েছে ভারতের জাতীয় ইতিহাস অদ্যাবধি স্বাভাবিক পথটির সন্ধান করে নিতে পারেনি।

উপন্যাসের সার্থকতা বিচারে আনন্দমঠের কোনো দাম নেই। কিন্তু আনন্দমঠ সেই ধরনের বিরল একটি গ্রন্থ, যা রাজনৈতিক ঘটনাকে অনেকদিন পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রভাবের কথা চিন্তা করলে ভারতবর্ষে লিখিত অন্য কোনো পুস্তকের সঙ্গে আনন্দমঠের কোনোই তুলনা চলতে পারে না। 'বন্দেমাতরম' গানটি হলো আনন্দমঠের আত্মা। এই রচনায় উল্লেখ করা হয়েছে বঙ্কিমের মৃত্যুর সত্তুর বছর পরে এই গানটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যাপক বিরোধিতার মুখে রবীন্দ্রনাথ যদি না বলতেন গানটির মধ্যে পৌত্তলিকতার উপাদান রয়েছে, তাহলে জনগণ অধিনায়কের বদলে এটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হতো। তথাপি ভারতবর্ষের জনগণের একটা বিরাট অংশ বন্দেমাতরম গানটিকে ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত বলে মনে করে থাকেন। বন্দেমাতরম শব্দটি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছে মন্ত্রের মতো ক্রিয়াশীল হতে পেরেছিলো। বন্দেমাতরম একই সঙ্গে ছিলো স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি এবং স্বদেশ মুক্তির বন্দনাগান। বাঙালির রাজনৈতিক অন্দোলনের ইতিহাসে আনন্দমঠ গ্রন্থটি যে ভূমিকা পালন করেছিলো, জ্যাঁজাক রুশোর লে সোস্যাল কন্ট্র্যাক ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক গ্রন্থ মানুষের আবেগের ঘরে এতোখানি আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আনন্দমঠ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে একটি নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। একদল বিপ্লবী তরুণ তাঁদের জীবনাচরণের পদ্ধতিটি এই গ্রন্থের পাতা থেকে শিক্ষা করেছেন। বঙ্কিম যেনো আলাদীনের আশ্চর্য পিদিমের ঘষায় বলতে গেলে একেবারে শূন্য থেকে এই নিস্তেজ বাঙালিদের মধ্যে একটা গণসংগ্রাম জাগিয়ে তুললেন। এই আন্দোলনের পদ্ধতি এবং প্রকরণ সবটাই আনন্দমঠ গ্রন্থের থেকে নেয়া। এই গ্রন্থের সমস্ত অক্ষর জীবন্ত হয়ে বাংলার মাঠ-ঘাট, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।

আনন্দমঠের মধ্যেই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূর্ণ দৈর্ঘ মুক্তি পেয়েছিলো। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যাঁদের কাছে আনন্দমঠের স্থান ছিলো, ঠিক গীতার পাশে তাঁরা বঙ্কিমকে তাঁদের মন্ত্রগুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। ডেপুটিগিরির ফাঁকে ফাঁকে এই হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্নটি সোনালী পদ্মের মতো বঙ্কিমের মনে দল মেলেছিলো। আনন্দমঠের গল্পটি একেবারেই মামুলি। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্বে এ ধরনের ঘটনা এন্তার ঘটেছে। আনন্দমঠের যা কিছু দাম, তাহলো সেই স্বপ্নটির কারণে। মাতৃভূমি দশ হস্তে দশ প্রহরণধারিনী দেবী দুর্গার মতো পরিপূর্ণ এক জীবন্ত সত্তা। বন্দেমাতরম গানটির মধ্যে দিয়ে মাতৃভূমির সেই জগতজননী রণজয়ী মূর্তিটিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিম যদি সম্পূর্ণ একটা কাল্পনিক পটভূমির ওপর প্রতিস্থাপন করে আনন্দমঠ উপন্যাসটি রচনা করতেন, পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজে যে রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জন্ম হয়েছে, সেগুলো আদৌ ঘটতো কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম একটা

বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্য নির্ভর পটভূমি বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে সন্ন্যাসী এবং ফকিরেরা মিলিতভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সেই বাস্তবতা থেকে ঘটনা আহরণ করে স্বদেশের যে উজ্জ্বল চিত্রপট নির্মাণ করলেন যাতে মুসলমান সমাজের তাতে কোনো অংশ নেই। আর চিত্রপট এমনভাবে নির্মাণ করলেন যাতে মুসলমানের সমাজ বঙ্কিমের কাল্পনিক স্বপ্নমূর্তিকে আপনার বলে মনে না করতে পারে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম থেকে মুসলমানের ভূমিকা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সমস্ত লড়াইটা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস বলে চিহ্নিত করলেন। এই বিষয়টি সকলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং মনোযোগের দাবি রাখে।

বঙ্কিম আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাটি পেয়েছিলেন ইউরোপীয় দার্শনিকদের কাছ থেকে। তাঁরা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র এবং ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপরেখাটি নানাভাবে বিকশিত করেছিলেন। এই ধারণাগুলো অবশ্যই বঙ্কিমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একটা সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা বঙ্কিমের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু তিনি একটি ধর্মতান্ত্রিক হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখলেন কেনো? খুবই সহজ জবাব, রাষ্ট্র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ তিনি সেটি মানতে রাজি ছিলেন না এবং সেই জিনিশটি সমস্ত গণ্ডগোলের অংশ। মজার ব্যাপার হলো, যে পটভূমিটির ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্কিম হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিলেন, তার সমস্ত কুশীলব হিন্দু ছিলেন না। হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলিতভাবেই ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর স্বপ্ন নির্মাণের সময়ে মুসলমান সমাজকে ইতিহাসের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করলেন।

বঙ্কিমের কল্পিত হিন্দু সমাজের একটা বিরাট অংশের মন-মানস অধিকার করে নিয়েছিলো এবং সেখান থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সূচনা। বঙ্কিমের এই একপেশে হিন্দু রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি জিনিশের তুলনা করা যায়। বাড়িতে দই পাততে গেলে বাজার থেকে সামান্য পরিমাণ তাজা দইয়ের সাজ বা বীজ এনে দুধের সঙ্গে মেশাতে হয়। দইয়ের সাজে যদি কোনো দোষ থাকে, সেই দোষ সম্পূর্ণভাবে নতুন দইয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাস্তবতা মন্থন করে তাঁর স্বপ্নটি রচনা করেছিলেন, তাতে প্রকৃত বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাননি। সুতরাং তাঁর স্বপ্নের মধ্যেই দোষ ছিলো। এই বিষাক্ত স্বপ্ন ইতিহাসের অগ্রযাত্রার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটি গরল স্রোত বইয়ে দিয়েছিলো।

হিন্দু সমাজের উথানের উন্মেষ পর্বে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন এতোটা গাঢ়মূল হয়েছিলো যে, তার অভিঘাত মুসলমান সম্প্রদায়কে আরেকটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করার প্রয়োজনে হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন, উপযোগবাদের এই দিকটি দু'সম্প্রদায়ের নেত্রীবৃন্দ মেনে নিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক পাটাতনে দাঁড়াতে পারেননি।

মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্রবোধ যখন প্রখর হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে, এই পর্যায়ে দেখতে পাবো সৈয়দ ইসমাইল হোসের সিরাজী বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনী উপন্যাসের দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে রায় নন্দিনী উপন্যাস লিখছেন। বঙ্কিমের শিল্পচাতুর্য এবং জীবনদৃষ্টি সিরাজী কোথায় পাবেন? উপন্যাস হিসাবে রায় নন্দিনী কোনো পর্যায়েই পড়ে না। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদটি খুবই প্রাসঙ্গিক। ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিবাদের ধরনটি যা হওয়া উচিত ছিলো, সিরাজী সাহেব অশোধিত আবেগ দিয়ে সেই কাজটি করেছিলেন। এখানে আসল ব্যাপার হলো পরবর্তী প্রজন্মের একজন ধর্মান্ধ মানুষ প্রজন্মের অরেকজন ধর্মান্ধ মানুষের চিন্তার প্রতিবাদ করছেন। দু'য়ের শিক্ষা সংস্কৃতির মান এক নয় বলেই প্রতিবাদের প্রকাশটাও শোভনতার মাত্রা রক্ষা করতে পারেনি।
আরো পরে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এককালীন কংগ্রেস নেতা মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে একদল মুসলিম রাজনীতিবিদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মী বঙ্কিম লিখিত আনন্দমঠ পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন করেছেন। পুস্তক পোড়ানোর ব্যাপারটি একটি বর্বর পদ্ধতি। সেই সময়েই মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো কোনো লেখক সে কথা উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একটি মন্দ কাজও কি কারণে ঘটে থাকে, প্রকৃত কারণটি খুঁজে বের না করলে তাৎক্ষণিক নিন্দা প্রশংসায় বিশেষ লাভ হয় না। মাওলানা আকরাম খানেরা যখন আনন্দমঠ পোড়ানোর উৎসব করছিলেন সেই সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পালে বাতাস লেগেছে। দলে দলে মানুষ জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছেন। পাকিস্তান আন্দোলন গতিশীল হয়ে ওঠার পরিস্থিতিতে আনন্দমঠের বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন হওয়ার একটি ব্যাখ্যা এভাবে দাঁড় করানো যায়। ধর্মতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের লড়াকু সমর্থকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতান্ত্রিক হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শটিকে আঘাত করার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আনন্দমঠ উপন্যাসটি উৎসব করে পোড়ানোর মধ্য দিয়ে ঘটিয়েছেন।
সেই পুরোনো প্রসঙ্গটিতে আবার ফিরে আসি। বঙ্কিম কি সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন? সাম্প্রদায়িক লেখক হলেও কতোদূর সাম্প্রদায়িক? আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ের সবচাইতে শিক্ষিত মানুষ না হলেও সবচাইতে শিক্ষিত মানুষদের একজন ছিলেন। তিনি অনেকাংশেই ছিলেন একজন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ। সাম্য, বাঙ্গালার কৃষক, বাঙ্গালার ইতিহাস এই সমস্ত রচনা তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। অবশ্য তিনি শেষ বয়সে সাম্য এবং বাঙ্গালার কৃষক রচনা দু'টো ঘোষণা দিয়ে বর্জন করেছিলেন। তা হোক, বঙ্কিম তো আর তাঁর নিজের জীবনের বিশেষ একটা পর্যায়কে জীর্ণ বস্ত্রের মতো শরীর থেকে খুলে বর্জন করতে পারেন না। লেখকের রচনা তো তাঁরই জীবনের একটি অংশ। আধুনিক চিন্তা চেতনার অনেকখানিই তিনি রপ্ত করেছিলেন। তাঁর অনেক রচনাতেই মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত একজন

লেখকের হাত দিয়ে মানবিক অনুভূতিসমূহ আগুনের ফুলকির মতো ঝরে পড়েছে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাঁর রচিত সাহিত্যের একটা বিরাট অংশে আবেগ, অনুভূতি, ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ মানুষকে তাঁর পূর্ণ পরিচয় দেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং সে রচনাগুলো সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ লেশ বর্জিত। কিন্তু বঙ্কিম যেখানে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেখানে তিনি ঘোরতরো হিন্দু। হিন্দুত্ব তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, হিন্দুত্বই তাঁর জীবন এবং নির্বাণ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুত্বের বাইরে কোনো কিছুই তাঁর বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পথে যা কিছু অন্তরায় মনে করেছেন, সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়া তাঁর পরম পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

হিন্দু রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপরেখা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিলো না, শুধু অতীতের কিছু ঝাপসা স্মৃতি, ধোঁয়া ধোঁয়া, ছায়া ছায়া কিছু অনুভবই ছিলো তাঁর পাথেয়। সহজাত প্রবণতা বশে তিনি শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের হিন্দু রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হলে তার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারে, যে সকল রাষ্ট্রাদর্শ সেগুলো ঝাড়ে বংশে উৎপাটন করে ফেলতে হবে। বঙ্কিম সমস্ত জীবন ধরে মারাত্মক রোগের জীবাণুর মতো সেই ধ্বংসকীট বয়ে বেড়িয়েছেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস, যে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বদেশাত্মার মর্ম বাণীটি আবিষ্কার করেছিলেন; সেই একই শক্তিমান মন্ত্র মহাকালের খড়্গের রূপ ধারণ করে তাঁর আপন মাতৃভূমিকে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেললো। মাতৃমুক্তির মন্ত্রের অপপ্রয়োগ করে বঙ্কিম মাতৃ অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলেন। ভারতের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু বাংলা বিভাগের জন্য যদি কোনো মানুষকে একক দায়ী করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে? যাঁর কাঁধে এই দায়ভার চাপানো যাবে।

ছয়

আনন্দমঠকে যদি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে তুলনা করা হয়, কৃষ্ণচরিতের তুলনা করতে হবে ডাস ক্যাপিটালের সঙ্গে। আনন্দমঠে বঙ্কিম যে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রণধ্বণিটি উচ্চারণ করেছেন এবং কৃষ্ণচরিতে সেই হিন্দু রাষ্ট্রের একটা তাত্বিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি এমন একজন আদর্শ রাষ্ট্রগুরু হিসেবে এঁকেছেন যাঁর দৃষ্টান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করলে ভারতের হিন্দুরা জগতের বুকে একটি শক্তিমান জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু জনসমাজে দুজন মানুষের প্রভাব এতো গভীরতরো এবং সুদূরপ্রসারী হতে পেরেছে, হাজার হাজার বছরের পরে আবাল বৃদ্ধ হিন্দু নরনারী এই দু'জন মানুষের স্মৃতি অন্তরে অনুরাগ ভরে লালন করেছে। বিপদে তাঁদের কাছে বরাভয়, শোকে সান্ত্বনা, এবং নশ্বর জীবনের অন্তে পরপারের সদগতি প্রার্থনা করেছে। তাঁদের একজন অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র এবং অন্যজন শ্রীকৃষ্ণ। দু'জনেই বিচারশীল নরপতি, ক্ষত্রিয় বীর, সাহসী যোদ্ধা এবং আদর্শ মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর অভিনিবিশের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর কারণও আছে। রামচন্দ্রের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের মানুষ। তাঁর পবিত্র মুখ থেকেই গীতার পবিত্র শ্লোকসমূহ নির্গত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী দৈনন্দিন জীবন ধারণের একটি দিক নির্দেশকের ভূমিকা গীতা থেকে পেয়ে থাকে। যাঁর মুখ থেকে গীতার পবিত্র শ্লোকসমূহ নির্গত হয়েছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের ধারক বাহক করে দেখাতে পারলে হিন্দু সমাজে খুব সহজে বঙ্কিমের মনের কথাটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে, তিনি একথা চিন্তা করেছিলেন। বঙ্কিম ভুল চিন্তা করেননি।

এই ভারত ভূমিতে যুগে যুগে কৃষ্ণের মহিমা নানাভাবেই কীর্তিত হয়েছে। যদিও কৃষ্ণ প্রকৃত আর্য বংশদ্ভুত ছিলেন কিনা অদ্যাবধি সেই বিতর্কের অবসান হয়নি। ঋগ্বেদে কৃষ্ণের নাম উদ্ধৃত হয়েছে কয়েক বার। বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহেও কৃষ্ণকে নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে অনেক। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং তাঁর যে ভূমিকা সেই জিনিশটিই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসনের ইতিহাসে অদ্যাবধি দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরাজমান রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অন্যবিধ কীর্তি, যোগ্যতা এবং গুণাগুণের কথা বাদ দিলেও শ্রীমদ্ভাগবদগীতাই একমাত্র গ্রন্থ যা আধুনিক ভারতের নানা মতের হিন্দুর সংযোগের হেতু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ মানুষ একজন হলেও তাঁর অনেকগুলো পরিচয়। তিনি রাখালবেশী গোপ বালক। বৃন্দাবনের গোষ্ঠ বিহারী অপূর্ব লীলাময় বংশীধারী, গোপ ললনাকুলের কামনার ধন। মথুরায় তিনি দণ্ডধারী মহারাজ। কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের সম্মুখ সমরে অর্জুনের সারথী। নতুন নতুন রণকৌশলের উদ্যোক্তা, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার প্রবক্তা, শান্তির সময়ে দক্ষ কূটনৈতিক, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে যুদ্ধ শান্তির নীতি নির্ধারক, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ রাজা, পরাক্রান্ত অজেয় বীরযোদ্ধা এই এতোগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাঁকে পুরুষ বলে ভাবা হলেও তিনি পরম পুরুষ না হয়ে যান না। আকৃতিতে তিনি নর হলেও আসলে তিনি নারায়ণেরই অংশ— একজন অবতার। পৃথিবীতে দুষ্টরা যখন রাজ্যপীঠ বিস্তার করে সৎ মানুষদের জীবনযাত্রা যখন অসম্ভব করে তোলে, পরিত্রাণের আশায় ধরণী ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে সেই সময়ে একজন অবতার পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। আসলে নারায়ণই নরবেশে নরকুলের উদ্ধার মানসে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ একজন অবতার নারায়ণের অংশ। তাঁর পূর্ববর্তী অবতার ছিলেন অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতার হিসেবেই পূজিত হয়ে আসছেন। তথাপি সময়ের বিবর্তনে লোক সমাজে তাঁর আরেকটি পরিচয় বিস্তার লাভ করতে পেরেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দেবতাও বটে— এই প্রেম দু'ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়, দেহবাদী প্রেম এবং দেহাতীত প্রেম। অন্য অর্থে নরনারীর প্রেম এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্তী প্রেম। প্রেমের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেনো, দেহবাদী প্রেমেরও আলাদা একটি মহিমা রয়েছে। প্রেমের সেই একান্ত ভোগবাদী আদর্শটি শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিকে ঘিরেই পল্লবিত হয়েছে। গ্রীক পুরাণে পান এবং রোমানদের বাক্কাসকে যেভাবে সম্ভোগের দেবতা হিসেবে দেখা হতো শ্রীকৃষ্ণের এ সম্ভোগ সমৃদ্ধ ভাবমূর্তি লোকসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আসলে এ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপলক্ষ করে নানান ভারতীয় ভাষায় যে অজস্র গান রচিত হয়েছে, দুনিয়ার কোনো একক মানুষের স্মৃতিকে অবলম্বন করে অতো গান রচিত হয়নি। এই গান রচনার ধারাটি আমাদের সময়েও সক্রিয়।

হিন্দু সমাজে শ্রীকৃষ্ণের পুজো প্রচলিত হওয়ার পর থেকে সময়ের চাপে তাঁর অন্যবিধ পরিচয়সমূহ ক্ষয়ে ক্ষয়ে তাঁর প্রেমিক পরিচয়টিই ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতি লাভ করেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নদীয়ার মহাপ্রভূ করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের নতুন ধরনের পূজার প্রচলন করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ভাবমূর্তি যে আঙ্গিকে স্থাপন করলেন তাঁর সঙ্গে ইতিহাসসম্মত কৃষ্ণচরিতের তুলনা করে বিশেষ ফল লাভ হবে না। শ্রীচৈতন্য দেবকে হিন্দু সমাজের বিশেষ একটা আপদকালে নতুন করে কৃষ্ণপুজোর প্রচলন করতে হয়েছে। এই নতুন কৃষ্ণ ভজনার রূপ এবং স্বাদ একেবারে আলাদা। মুসলমান শাসন দৃঢ়ভাবে চেপে বসায়, হিন্দু সমাজ আতঙ্কে তটস্থ। রাজশক্তির প্রতাপ এবং সুফি দরবেশের প্রভাবে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লেগেছে। এই মারমুখী প্রভাব ঠেকাবার কোনো কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয়ে ব্রাহ্মণ্য

সম্প্রদায় নতুন আচারের জাল বিস্তার করে কোনো রকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলো। এই আচার যতো কড়াকড়ি আকার ধারণ করেছিলো, ধ্বসটা ততো বেশি করে নামছিলো। এই পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব এসে জানালেন, আচণ্ডাল সকলকে কোল দিতে হবে এবং এটাই ধর্ম। মেথর হোক, মুচি হোক, চাই কি হোক মুসলমান যে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করবে, উদ্ধার পেয়ে যাবে। কৃষ্ণনামের ভজনাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। হাটে, মাঠে, বাটে সঙ্গী-সাথী নিয়ে সর্বত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে থাকলেন। নামগানের রসে আকৃষ্ট হয়ে যে এলো জাতপাত বিচার না করে শ্রীচৈতন্য সকলকেই আলিঙ্গন করলেন এবং সকলকেই কোল দিলেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ছিলেন সেই আশ্চর্য পুরুষ, আপন হাতে একটি বাক্যও রচনা না করে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনামের যে মন্ত্র প্রচার করলেন, তা হিন্দু সমাজে মন্ত্রশক্তিই বিস্তার করলো এবং হিন্দু সমাজের ধ্বস নামা বন্ধ হলো এবং নতুন একটি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হিন্দু সমাজ আপন অস্তিত্বের জয়ধ্বনি করলো।

ইংরেজ রাজত্বের একটা বিশেষ পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আরো একবার শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিতে হলো। শ্রীচৈতন্য যে পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন, বঙ্কিমের পরিপ্রেক্ষিতটা তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রীচৈতন্য হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের লক্ষ্য হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষা নয়, হিন্দু জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের নিজেদের একটা রাষ্ট্র চাই। একটি নতুন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একজন রাষ্ট্রগুরু চাই, যাঁর উপদেশ, শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করলে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি প্রশস্ত হয়। সুতরাং বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ এক নয়। শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ পাপি-তাপির ত্রাণকর্তা, একবার মাত্র নাম উচ্চারণ করলে উদ্ধার পেয়ে যায়। বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন মানুষ। তিনি রাজা, কিন্তু এই পরিচয় শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের ভগ্নাংশও প্রকাশ করে না। তার আসল পরিচয় হলো তিনি রাষ্ট্রগুরু এবং ধর্ম ব্যাখ্যাতা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ একজন রাষ্ট্রগুরু, তাই তিনি যুদ্ধশান্তির নিয়ম নীতি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, দক্ষ, সাম, দান, দণ্ড ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার সবগুলো ফন্দি ফিকির তাঁর নখদর্পনে। যুদ্ধ এবং শান্তির বিষয়ে উৎকৃষ্ট পরামর্শ দিতে পারেন। যেহেতু তিনি অবতার ধর্মব্যাখ্যা এবং সংস্থাপন করা তাঁর আরেকটি প্রধান কর্তব্য। মানব জীবনের সর্বোচ্চ কর্তব্য তিনি স্থির করে দিতে পারেন, সামাজিক শ্রেণীগুলো কার কোথায় স্থান, কার কি দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তাছাড়া মানুষের ঐহিক এবং পারলৌকিক লক্ষ্যসমূহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। প্লেটো যে ধরনের প্রাজ্ঞ শাসককে দার্শনিক নরনাথ বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর ভারতবর্ষে যাঁরা রাজর্ষি বলে স্বীকৃতি লাভ করতেন, বঙ্কিমচেন্দ্রর শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতে যে পর্যায়ভুক্ত করার উপায় নেই। মিশর থেকে ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসার সময় মুসা নবীর যে ভূমিকা

ছিলো, সমস্ত প্রতিকূল বাধা চূর্ণ করে হযরত মুহম্মদ যেভাবে মুসলমানদের ইহকাল পরকালের অবিসংবাদিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান অবিকল সে রকম।

জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের একটি উদ্ধৃতি খুবই প্রনিধাণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু চিন্তার গভীরতা সমুদ্রের মতো, তল পাওয়ার কোনো উপায় নেই, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই যে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। আবার রাশিয়ানদের চিন্তার নির্দিষ্ট আকার আছে, কিন্তু গভীরতা নেই। প্রাচীন হিন্দুরা যে চিন্তার ভাণ্ডার রেখে গেছে, হিন্দু সমাজের সঙ্কটকালে সেই চিন্তার ভেতর থেকে নতুন প্রাণশক্তি বিকিরিত হয়ে সমাজে নতুন ভাবের প্লাবন বইয়ে দিতে পারে। এই পুরাতন চিন্তা, মীথ, ব্যক্তিত্ব, নতুন হয়ে ওঠার বেলায় পুরাতনের কিছু যেমন থাকে, তেমনি যে পরিস্থিতির চাপ এবং প্রয়োজনে সে চিন্তা, মীথ ব্যক্তিরা প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে সেই পরিস্থিতিও অনেকখানি আত্মসাৎ করে ফেলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচৈতন্যদেব বর্ণিত কৃষ্ণ নন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে কৃষ্ণের কথা অলোচিত হয়েছে তিনিও নন। মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণসমূহে যে অবতার কৃষ্ণের কীর্তি গাঁথা রসসমৃদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ তার চাইতে আলাদা। নরনারী কিংবা জীবাত্মা পরমাত্মার গহন সম্পর্কের দেবতা শ্রীকৃষ্ণও বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত অনুধ্যানের উপজীব্য বিষয় নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত, ইংরেজের ডেপুটিবাবু বঙ্কিমচন্দ্র একটি হিন্দু রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়োজনে একজন রাষ্ট্রগুরুর সন্ধান করেছিলেন এরং শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত তাঁর সে প্রয়োজনটা মিটিয়েছিলো। সুতরাং বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিতের সঙ্গে অন্যবিধ কৃষ্ণচরিতের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিতে অন্যবিধ পরিচয় ছাপিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাষ্ট্রগুরু পরিচয়টাই প্রধান হয়ে উঠেছে। যেহেতু তিনি অবতার, তাই তার ধর্মগুরুর দিকটি ও উপেক্ষিত হয়নি। কিন্তু ধর্মরাষ্ট্রে রাজনীতি এবং ধর্মচর্চা দু'য়ের মধ্যবর্তী ভেদরেখা থাকতে পারে না। একটা আরেকটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মেশামেশি করে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের একটি অভিনব জীবন চরিত রচনা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে তার অনেকগুলোকেই একেবারে ছেটে বাদ দিয়েছেন। কৃষ্ণের জীবন কথা এমনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেঁথে তুলেছেন, আগাগোড়া শ্রীকৃষ্ণের জীবন কথাটাই যেনো তার উদ্দেশ্যানুগ রূপ লাভ করে। কৃষ্ণপুরাণসমূহে তাঁর অবতার সত্তাকে প্রধান করে দেখানোর প্রয়োজনে পুরাণকারেরা যে সব অবাস্তব কল্পকাহিনী জুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের চেনা জানার বাইরে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব স্থাপন করেছেন, বঙ্কিম সে সব যথাসম্ভব বাদ দিয়ে, যেখানে বাদ দিলে কৃষ্ণের জীবন কথা চেনা যাবে না; সে সমস্ত জায়গায় নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে একজন অসাধারণ মানুষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। অথচ পুরাণকারদের মতো বঙ্কিমও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ একজন অবতার।

বঙ্কিমের অবতার একজন মানুষের শিক্ষাদাতা। যদিও তাঁর ঐশী অংশটা অত্যন্ত প্রবল। একজন অবতারকেও মানবিক বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করেই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করতে হয়। মানুষ অবতারদের এই সকল ক্রিয়াকলাপ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা করে থাকে। যদিও একজন সাধারণ মানুষ কখনো অবতারের স্তরে উঠতে পারবে না, তথাপি অবতারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তার শক্তি এবং ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাতে পারে। এই কারণেই অবতারেরা মানব জাতির অনুসরণীয় শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণ রাষ্ট্রগুরুর চেহারায় ধরা পড়েছেন। তাঁর সমস্ত কর্মের ভালো মন্দ রাজনৈতিক মাণদণ্ডে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেটাকেই তিনি ধর্মসম্মত বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কংস বধ, শিশুপাল নিধন এবং জরাসন্ধ হত্যা এই সকল অক্ষত্রিয়োচিত অন্যায় কর্মকে এভাবেই যুক্তিসিদ্ধ করেছেন, এই রাজারা সকলেই ছিলেন পাপিষ্ঠ এবং অন্যায় কর্মের সমর্থক। সুতরাং তাঁদের ছলে বলে কলে কৌশলে নিরস্তিত্ব করে ফেলা নিতান্তই ধর্মসম্মত কর্ম।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সকল কলাকৌশল অবলম্বন করে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যকে নিহত করার কারণ হয়েছেন, কর্ণার্জুনের যুদ্ধে কাদায় দেবে যাওয়া রথের চাকা উত্তোলনরত নিরস্ত্র কর্ণকে যেভাবে অর্জুনকে প্ররোচিত করে হত্যা করালেন, স্বয়ং মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাসও এই সমস্ত কর্ম নীতিসম্মত বলে মেনে নিতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। গদাযুদ্ধে ভীমকে দিয়ে যেভাবে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করালেন, সেই অপরাধের জন্য দুর্যোধন-মাতা গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও ছত্রিশ বছর পর নিতান্ত করুণভাবে নিচ জাতির মানুষের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ একটার পর একটা অন্যায় কর্ম সম্পাদন করেছেন, কিন্তু এগুলো শ্রীকৃষ্ণ মনে করেছেন, ধর্মসম্মত। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মটাই আসল ধর্ম। এখানে রাজনীতিটাই ধর্মের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের একটা রাজনীতি ছিলো। তৎকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় অবস্থানে দাঁড় করানো এবং বর্গকরণ, স্তর বিন্যাস পরস্পরের ওপর স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়ে প্রতিটি বর্ণকে আলাদা করে গোটা সামাজিক কাঠামোকে একটা অচল স্থিতাবস্থার ওপর স্থাপন করাই হলো তাঁর ধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবদগীতার অধ্যাত্মিক অর্থ যাই হোক না কেনো, ব্যবহারিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে জন্মগতভাবে কিছু মানুষ উৎকৃষ্ট, কিছু মানুষ অপকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টের কর্তব্য হলো উৎকৃষ্ট মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। কৃষ্ণের সমাজনীতি এবং রাজনীতি দু'টোই ভারতীয় সমাজে ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। এই ব্যবস্থাটিকে দীর্ঘস্থায়িত্ব দেয়ার জন্যই তিনি গীতা গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। গীতাকে কি কাব্য বলা যায়? নাকি নীতিশাস্ত্র? নাকি দর্শন? নাকি সংখ্যাধিক মানুষকে হাজার বছর ধরে বোধবুদ্ধির দিক দিয়ে বামুন করে রাখার সব চাইতে উৎকৃষ্ট মগজ ধোলাইয়ের মনস্তাত্বিক যন্ত্র? একথা অল্প বিস্তর সব ধর্ম পুস্তক সম্পর্কে বলা চলে।

বঙ্কিম কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল এই সব রাজাদের দুর্বৃত্ত এবং পাপিষ্ঠ বলে হননযোগ্য ধরে নিয়েছিলেন, তাঁদের পাপ এবং দুর্বৃত্তপনার মুখ্য প্রমাণ হলো, তাঁরা সকলেই ছিলেন আঞ্চলিক স্বাধীন রাজা। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনতা মেনে নিতে রাজি না হওয়াই ছিলো তাঁদের মস্ত অপরাধ। কেন্দ্রীয় শাসন দৃঢ়, সবল এবং নিষ্কন্টক করাই ছিলো শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতি। এই রাজনীতিই রাজন্যবর্গের জন্য নিয়তির ভূমিকা পালন করেছিলো।

প্রসঙ্গত আমি দীনেশচন্দ্র সেনের বিষয়টি উথাপন করতে চাই। দীনেশ এবং বঙ্কিমের মধ্যে বয়সের বিরাট ফারাক। বঙ্কিম যখন প্রৌঢ়, মৃত্যুর দিন গুণছেন, দীনেশ তখনও তরুণ। দীনেশচন্দ্র ছিলেন পূর্ব বঙ্গীয় বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক। সারা জীবন চেষ্টা করেও ঘটি উচ্চারণ পদ্ধতি রপ্ত করতে পারেননি। তাঁকে নিয়ে অনেকেই ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করতেন। যদিও দুজনের মধ্যে বেশি দেখা সাক্ষাত ঘটেনি, তথাপি এই পূর্ব বঙ্গীয় বৈদ্য বঙ্কিমের রাগ, উষ্মা এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তার কারণ অবশ্যই আছে। বঙ্কিমবাবু কংশ, জরাসন্ধ, শিশুপাল এই রাজাদের ধর্মের প্রয়োজনে হত্যা করা হয়েছিলো বলে দাবি করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর দু'খণ্ডে সমাপ্ত 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে এই বঙ্কিমবাবুর ধর্মের আসল স্বরূপটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই এই সব রাজাদের হত্যা করেছেন। দীনেশ সেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেই জিনিশটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই রাজারা সকলেই আঞ্চলিক স্বাধীন নৃপতি। শ্রীকৃষ্ণের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে অবশ্যই তাঁদের অপরাধী বলতে হবে। তাঁদের আপন স্বজনদের কাছে ছিলেন স্বাধীনতার শহীদ। দীনেশচন্দ্র সেন এই বিষয়টা যুক্তি প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করেছিলেন। দীনেশবাবুর আরো একটা অপরাধ ছিলো, সেটাও কম গুরুতর নয়। বঙ্কিমবাবু বাঙ্লা ভাষার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও সংস্কৃতের কাঠামোর মধ্যে সীমিত রাখতে চাইতেন। আর বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবর্তী করার একটা মনোগত অভিপ্রায় বঙ্কিমের ছিলো। সংস্কৃতের অনুবর্তী মানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটাই বোঝানো হচ্ছে। অন্যদিকে দীনেশবাবু লোক সাহিত্য চর্চা এবং সংগ্রহ করে সারস্বত সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের আরেকটা উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল ঐতিহ্যের রুদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন সারস্বত সাহিত্যের সমান্তরালে একেবারে সাধারণ মানুষেরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তার নন্দনতাত্ত্বিক মান কিছুতেই তুচ্ছ কিংবা ফেলনা নয়। আরো একটা বিষয় স্পষ্ট করে তুলে ধরে অভিজাত্যাভিমানী শ্রেণীর অহঙ্কারের গোড়া ঘেঁষে কোপ বসিয়েছিলেন। সাহিত্যে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর অধিকার নেই। বাংলা সাহিত্যে আসলে বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। উভয়ে মিলে নির্মাণ করেছে সাহিত্যের শরীর, উভয়ের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে প্রাণ। অবদান কারো কম, কারো বেশি।

বঙ্কিমবাবু দীনেশসেনের ওপর কি রকম চটে গিয়েছিলেন, দীনেশবাবু গল্পচ্ছলে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। একবার দীনেশসেন মহাশয় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁর সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে একটি বাক্যও আলাপ করেননি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন দীনেশবাবুদের ওখানে তাজা তরি তরকারি পাওয়া যায় কিনা। সোনামুগ কি বাজারে বিক্রয় হয়, কচি লাউ এবং পাঠার মাংস নিয়মিত আসে কিনা। আনাজ তরকারির দাম জানতে চেয়ে বঙ্কিমবাবু দীনেশসেনকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তোমার সঙ্গে তরিতরকারি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আলাপ করতে পারি। সাহিত্য উচ্চমার্গীয় ব্যাপার। সেসব তুমি বুঝবে কেনো? যদি বুঝবে তো তুমি শ্রীকৃষ্ণের পূতপবিত্র চরিত্রে কোন্ সাহসে কলঙ্ক কালিমা লেপন করো? বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনেশসেনের আলাদা সাহিত্য রুচি এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বিরোধ লুকিয়েছিলো। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিষয়টা শুধু দু'জন মানুষের নয়, তাবত বঙ্গীয় সংস্কৃতির এবং রাজনীতির। এই বিরোধের একটা নিরাকরণ অবশ্যই করতে হবে। নইলে বাঙালি তার পূর্ণ সত্তা ফিরে পাবে না।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বঙ্কিমের দৃষ্টিতে একজন অবতার। এই অবতারের মূল কাজ ছিলো ধর্ম সংস্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। রাজ্যে যখন বিপ্লব ঘটে, বিদ্রোহ যখন রাজসিংহাসন টালমাটাল করে ফেলে কিংবা পর রাজ্যের আক্রমণে ধন প্রাণ বিপন্ন হয় অথবা অত্যাচারী রাজপুরুষদের নির্যাতনের কারণে প্রজাসাধারণের জীবনে ভোগান্তির অন্ত থাকে না, তখনই শান্তি বিঘ্নিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত কাঠামো কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখলে সমাজে আর শান্তিভঙ্গের অবকাশ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম এবং শান্তি উভয়ের অর্থই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে। কোনো কারণে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে বার বার শান্তি সংস্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। তার পরও যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, যে বা যারা শান্তি ভঙ্গকারী তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পবিত্র কর্তব্য। কেনো ক্ষত্রিয় যদি ন্যায়যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দিত হবে এবং পরলোকে থাকবে তার ভাগ্যে অনন্ত নরকবাস।

কৌতূহলী পাঠক, এইখানে অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরবর্তীকালের আরেকজন মানব শিক্ষকের একটা তুলনা করার অবকাশ পাবেন। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের মানুষ। আমি আরবের নবী হযরত মুহম্মদের কথা বলছি। তিনিও তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম রেখেছিলেন ইসলাম তথা শান্তি। তিনি নিজেকে রাহমাতুল্লিল আল-আমিন, মানে বিশ্বজগতের প্রতি আশির্বাদ বলে পরিচয় দিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয়টা শ্রীকৃষ্ণ যে দৃষ্টিতে বিচার করতেন, তার সঙ্গে হযরত মুহম্মদের মতামতের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে অকারণে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একমাত্র আক্রান্ত হলেই তোমার প্রতিরোধ করার অধিকার আছে। আক্রান্ত না হলে খবরদার আক্রমণ করবে না। যুদ্ধ শুরু করার আগে শান্তি বজায় রাখার সব রকমের চেষ্টা এবং

যত্ন করবে। কিন্তু যুদ্ধ যদি তোমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, সে যুদ্ধ করা তোমার পক্ষে ফরজ– অবশ্য কর্তব্য। শান্তি প্রচারের প্রয়োজনে যে যুদ্ধ তোমার জন্য এসে পড়েছে, তাতে অবশ্যই শামিল হবে। তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না। পৃষ্ঠ প্রদর্শন কিংবা কর্তব্যে অবহেলা করলে পরকালে তোমাকে নরকবাসী হতে হবে। মনে রাখবে ধর্মযুদ্ধ তোমার ঈমানের তথা অঙ্গীকারের অংশ।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের একটি আধুনিক চরিত কথা, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা করার প্রাক্কালে খুব সম্ভবতো হযরত মুহম্মদের জীবনী খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন। এখানে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের উদ্ধৃতি আবার নতুন করে উল্লেখ করবে। হিন্দু চিন্তার গভীরতা আছে, আকার নেই। খুব সম্ভবতো কৃষ্ণচরিত রূপায়ণে হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকখানি সহায়তা করেছে। বঙ্কিম যে হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন তাঁর ধর্মতত্ত্বের একটি বাক্যের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। বঙ্কিম তাঁর পর্যালোচনার এক জায়গায় বলেছেন, হিন্দুরা যদি আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকার শুনে এবং অনুশীলন করে মুহম্মদের সময় আরব জাতি এবং ক্রমওয়েলের সময় ইংরেজ জাতি যে শক্তির অধিকারী হয়েছিলো, হিন্দুরাও জাতি হিসেবে সেরকম শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। বঙ্কিমের কথাগুলো নিজের জবানীতেই প্রকাশ করলাম।

কৃষ্ণচরিত এবং ধর্মতত্ব একে অপরের পরিপূরক গ্রন্থ। কৃষ্ণচরিতে যা ব্যক্তি বিশেষের মতবাদ আকারে প্রকাশ পেয়েছে, ধর্মতত্ব সেই মতামতসমূহের নির্বিশেষ রূপ। আমার বর্ণনার যা মূলকথা বঙ্কিমচন্দ্র হযরত মুহম্মদের জীবনী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই অবগত ছিলেন। যুগপ্রবর্তক ধর্মগুরু হযরত মুহম্মদ একটি শক্তিশালী জাতির স্রষ্টাও বটেন। তাঁর তিরোধানের একশো বছরের মধ্যেই তাঁর অনুসারিরা চীন সাম্রাজ্য ছাড়া তৎকালীন পৃথিবীর সবগুলো সাম্রাজ্যের ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা যুদ্ধকে শান্তিধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে দীন এবং দুনিয়া এক হয়ে গিয়েছিলো। এটা তো শ্রীকৃষ্ণেও ঘটেছিলো। যুদ্ধে জয়ী না হলে শান্তি ধর্মের প্রচার কিভাবে সম্ভব। আর যুদ্ধের সবচাইতে বড়ো নীতি জয় লাভ। রাজ্য বিস্তারের জন্য হোক আর মতবাদের জন্য হোক। হযরত মুহম্মদ এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা হলো, তার প্রাসঙ্গিকতা তুচ্ছ করার মতো নয়।

সাত

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে কি অবস্থা থেকে বাঙালির সমাজ জীবনের নিজস্ব আবহের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি যখন সাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে তখনো রাজপুতনার যুগ চলিতেছে।' বাস্তবিকই উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃজনের একটা উৎসব লেগে গিয়েছিলো এবং সেই সাহিত্যের প্রায় আশি ভাগেরই বিষয়বস্তু ছিলো রাজপুতনা থেকে আহরণ করা। বৃটিশ সেনা অফিসার জেমস টড Annals and antiquits of Rajasthan নামাঙ্কিত সুবৃহৎ গ্রন্থটি সঙ্কলন করে বেশ কটি খণ্ডে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। দেখা গেলো, সেই সংগ্রহ গ্রন্থটিই উনিশ শতকী বাংলার সৃজনশীল সাহিত্যরথীদের কাহিনী আহরণের উৎসভাণ্ডার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী দু'জনেই তাঁদের অনেক উপন্যাস এবং রচিত নাটকের প্লট জেমস টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে ধার করেছিলেন। খুব সম্ভবতো রবীন্দ্রনাথের কথাটির মধ্যে আপন পরিবারের লোকদের প্রতি একটা কটাক্ষ ছিলো। টডের গ্রন্থটা ইতিহাস নয়। রাজস্থানের চারণ কবিরা তাঁদের জাতীয় জীবনের যে সকল কাহিনী পথে ঘাটে গেয়ে বেড়াতেন, সেগুলো তাঁর লোকদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। যে কাহিনী জেমস টড সংকলন করেছিলেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের পরিমাণ ছিলো খুবই অল্প। কিন্তু কবিদের হাতে পড়ে তুচ্ছ অকিঞ্চিতকর ঘটনাচূর্ণ সত্য মিথ্যে মিলিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী রূপ পেয়েছে একজন ইংরেজ নন্দনও সেগুলোর প্রতি অনুরাগ পোষণ না করে পারেননি। একটা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কারণ যদি টডের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ইংরেজরা মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর তাদের আপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। সুতরাং মোগলদের প্রতি একটা বিদ্বেষ জ্বালিয়ে তোলার বাসনা যদি টডকে তাড়িত করে থাকে তাও অবিশ্বাস্য মনে হবে না। খুব সহজে ওটাকে বৃটিশের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির অংশ বলে মেনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে কাজটা ছিলো মানুষের মনের ওপর।

টডের বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কাহিনী আহরণ করে কাব্য উপন্যাস নাটক এবং আখ্যায়িকা রচনার একটা হিড়িক পড়ে গেলো। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বিরাট অংশ যখন তাঁদের আত্মাভিমান চরিতার্থ

করার জন্য নিজেদের অতীত ইতিহাস থেকে হন্যে হয়ে গৌরবের বিষয় সন্ধান করছিলেন, জেমস টডের সুবৃহৎ রাজস্থান গ্রন্থ তাঁদের সামনে সেই আত্মগৌরব এবং অতীত মহিমার নিদর্শনরাজি তুলে ধরলো। উনবিংশ শতাব্দীর ছোটো বড়ো প্রায় সকল কবি লেখকই রাজপুত বীর বীরাঙ্গনাদের জীবন কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে লেগে গেলেন। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরীশ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কেউই বাদ গেলেন না। এ হলো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্রষ্টাদের নামের ফিরিস্তি। অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান কতো কবি, লেখক, নাট্যকার যে রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করে পুস্তক রচনা করেছেন, তার সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেকগুণ বেশি।

রাজপুত বীর বীরাঙ্গনাদের জীবন কাহিনী নিয়ে যে সমস্ত কবি লেখক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন; তাঁদের প্রায় সকলের মধ্যে একটা প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য অতি সহজে লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত রাজপুত মোগল বা অন্যান্য মুসলিম রাজন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাঁদেরকে আর্যশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকী বাঙালি হিন্দু লেখকদের মধ্যে একটি মনোভাব ভালো রকমভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো, তাহলো এ রকম। যে সুসভ্য বলদর্পী আর্যজাতি ভারতবর্ষে ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিস্তার করেছিলো, বিদেশী, বিজাতি এবং বিধর্মীরা শতো শতো বছর ধরে নিষ্পেষণ চালানোর পরেও সেই গৌরব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারেনি। রাজপুতনার মরুভূমির পবিত্র বালুকণা সে সকল শহীদ বীর বীরাঙ্গনাদের স্মৃতি অম্লানভাবে রক্ষা করছে। আর্যত্বের গৌরববোধে উদ্দীপিত বোধ করেই দলে দলে বাঙালি লেখকেরা রাজস্থানের অভিমুখে মানসযাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই যে সর্বব্যাপ্ত মানস লক্ষণ তার কোনো জটিল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। তাঁরা সকলে হিন্দুর অতীতের মধ্যে গৌরবের বিষয় সন্ধান করছিলেন এবং টডের রাজস্থানের মধ্যে সে বস্তু পেয়ে গিয়েছিলেন। অতএব, ভারতের পুত্রগণ হিন্দু সমুদয় মুক্ত কণ্ঠে বল সবে ব্রিটিশের জয় আর রাজস্থান থেকে গৌরব গাঁথা সংগ্রহ করো।

সৎ, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠক এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। আচ্ছা রাজস্থানের রাজপুতরা সত্যি সত্যি অতীতের আর্যদের উত্তরসূরী ছিলেন? ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। রাজপুতদের সঙ্গে আর্যদের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। দূরতম অসম্ভব কল্পনাতেও আর্যদের সঙ্গে রাজপুতদের কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। রাজপুতরা ছিলো হুনদের বংশধর। তারাও সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর দিকে মুসলমানদের মতো বাইরে থেকে এসে বার বার হামলা করে ভারতবর্ষে ধ্বংস এবং হত্যাযজ্ঞের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলো। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবহমানতা এবং ভারতীয় চিন্তা ভাবনার স্বাভাবিক অগ্রগতি তারাই রুদ্ধ করে দিয়েছিলো, তা মুসলমানদের ভারত আক্রমণের পূর্বের ঘটনা। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা কোনো রকমই হত্যা, ধ্বংস

করেনি। মধ্যযুগের রীতি অনুসারে তারাও হত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ মন্দির ধ্বংস এসব কাজ অবশ্যই করেছে।

আমার বক্তব্য বিষয়ে ফিরে আসি। রাজপুতরা আর্য নয়। কিন্তু টডের গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে কোনো রকমের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ব্যতিরেকে উনিশ শতক, এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিকেও বাঙালি হিন্দু লেখকেরা রাজপুতদের আর্য হিসেবে শনাক্ত করে, সমস্ত শ্রদ্ধার্ঘ সমস্ত সাধুবাদ নিবেদন করেছেন। এই জিনিশটাকে একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা বলে মেনে নেয়াই সঙ্গত। মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যারাই প্রতিরোধ এবং প্রতিবন্ধকতা রচনা করতে পারবেন আর্য শিরোপা অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। একই রকম আরেকটি মানসিকতা থেকেই বাইরে থেকে এসে ভারতীয় হিন্দুদের যারা পরাজিত করেছে তারা সকলেই যবন, তাদের অন্য কোনো পরিচয় নেই। প্রথমে গ্রীক, তারপরে মুসলমান এবং তারপরে ইংরেজ। সময়ের ব্যবধানটা কিছুই নয়।

উনিশ শতকী হিন্দু লেখকেরা রাজপুতদের নামসমূহকে বার বার তাঁদের কল্পনাশক্তি বলে জীবন্ত করেছেন এবং এই সব জিনিশকে আর্য নিদর্শন ধরে নিয়ে তাঁদের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা এভাবে দাঁড় করানো যায়। তাঁরা গৌরবের কিছু নিদর্শন সন্ধান করছিলেন, তাঁদের নতুন সামাজিক ভিত্তি এবং নবজাগ্রত অনুভূতি গরীয়ান কিছুর দিকে ধাবিত করে নিয়েছিলো। নতুন একটা যুগের দাঁড় প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁদের মধ্যে একটি নতুন চিত্তক্ষুধা জন্ম নিয়েছে। কারণ অবচেতনে তাঁরা অনুভব করছিলেন ইতিহাস একটি নতুন যুগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে তুলে দিয়েছে। বৃটিশের এই অনুগ্রহভোগী মধ্যবিত্তের এই চিত্তক্ষুধাটা যেমনি অসার তেমনি ক্ষুধানিবৃত্তির যে খাদ্য সাহেবরা সরবরাহ করলেন, তাতেও পুষ্টিকর উপাদানের কিছু ছিলো না। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বাতাবরনটা যখন রাজপুতদের অলীক আর্যদের গৌরবের আচ্ছাদিত সেই পরিবেশে মাইকেল প্রহসন দুটো লিখলেন, ভবানীচরণ হুতোম প্যাঁচার নকশা, প্যারীচরণের আলালের ঘরের দুলাল, দীনবন্ধুর নীলদর্পন নাটক রচনা করতে পারলেন, এগুলোকে ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

রাজস্থানের মরুভূমি ঝিকিমিকি বালুকণার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু লেখক কবিরা কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে হিন্দু সভ্যতার লুপ্ত মহিমার অবলোকন করেছিলেন। এখানে একটি পশ্ন স্বতঃই উদয় হওয়ার কথা। ভারতবর্ষে মোগলদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো শক্তিকে যদি শনাক্ত করতে হয়, মারাঠিদের নাম অবশ্যই উচ্চারিত হওয়া উচিত। মারাঠা নায়ক ছত্রপতি শিবাজি মোগল শাসনের সমান্তরাল একটি শাসন পদ্ধতি কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু পাদপাদশাহী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাংশের মনে উত্তমরূপে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়, মারাঠি শক্তির উত্থানই তার অন্যতম কারণ।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালীর হাতে মারাঠা শক্তির যদি শোচনীয় পরাজয় না হতো, হয়তো শিবাজির উত্তরাধিকারীদের কেউ দিল্লীর মসনদ দখল করে হিন্দু পাদপাদশাহী কায়েম করে শিবাজির স্বপ্ন সফল করতে পারতেন। হিন্দু শৌর্যবীর্যের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত থাকা সত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি লেখকেরা হিন্দু গৌরবের সন্ধানে মহারাষ্ট্রের বদলে রাজস্থানে ছুটলেন কেনো সেটাও ভেবে দেখার ব্যাপার। তার পেছনে নানা রকম কারণ বর্তমান ছিলো। প্রথম কারণ বাঙালি জনগণের মনে আলীবর্দী খানের আমল থেকেই মারাঠাদের প্রতি খারাপ ধারণা শেকড় গেড়ে বসেছিলো। মারাঠি বর্গীদের বাঙলা আক্রমণের স্মৃতিকে উপলক্ষ করেই ছড়া লেখা হয়েছিলো, "ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে"। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ওই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন "নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়" । মারাঠা সৈন্য কর্তৃক নগর জনপদ পুড়িয়ে দেয়ার তিক্ত স্মৃতি বাঙালি জনগণের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো, মারাঠিরা হিন্দু রাজত্বের পুনরুত্থান ঘটালেও উনিশ শতকের বাঙালি লেখকেরা গল্প উপন্যাস এবং নাটকের নায়ক হিসেবে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা দেয়ার উপযুক্ত মনে করেননি। দ্বিতীয় কারণটি এও হতে পারে টডের মতো নিবেদিত প্রাণ কোনো সাহেব মারাঠিদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী আবেগ অনুভূতি দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীটির সামনে তুলে ধরেননি। ইংরেজদের পক্ষে মারাঠি শৌর্যের গুণকীর্তন করার কাজটি অতো সহজ ছিলো না। কারণ ইংরেজকে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে। গুণকীর্তন করে মারাঠা ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা কখনো কোনো বিদেশী শক্তি করতে পারে না। আর উনবিংশ শতাব্দীর মানস পরিমণ্ডলটাই এমন ছিলো যে, যে কাজ করলে সাহেবদের প্রীতি উৎপাদন করানো সম্ভব নয়; সে সব বিষয় নিষিদ্ধ বস্তু হিসেবে সযত্নে পরিহার করা হতো। এটা কি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখক, কবি এবং নাট্যকারদের কেউই শিবাজিসহ অন্যান্য মারাঠা চরিত্র অবলম্বন করে কোনো কিছু লিখলেন না। ভারতে অন্যূন আটশো বছরের মুসলমান শাসনে মারাঠারা যে দক্ষতা এবং যোগ্যতা সহকারে মুসলিম শক্তির প্রতিস্পর্ধী একটি শক্তি হয়ে উঠেছিলো, তেমন দৃষ্টান্ত তো আর একটিও নেই।

হ্যাঁ কথা উঠতে পারে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারাঠা নায়ক শিবাজিকে বিষয়বস্তু করে শিবাজি উৎসব শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। সে অনেক পরের ব্যাপার। এই সময়ের মধ্যে কাল প্রবাহের গতি অনেক দূর পরিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় শিবাজি উৎসব রচনার পটভূমি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'কবি তিলক (মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর তিলক) কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কবিতা লিখলেন' কিন্তু তাঁর মনে একটা সংশয় থেকে গেলো।তিনি কবিতাটা সংকলনগ্রন্থ (খুব সম্ভবতো সঞ্চয়িতা) থেকে বাদ দিলেন। মুসলমান সমাজের যে সকল

মানুষ যারা স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন না, তাঁদেরও একাংশ এই শিবাজি উৎসব কবিতাটি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। হুমায়ুন কবির (ভারতের শিক্ষামন্ত্রী) তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আকবরের ওপর একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ শিবাজি উৎসব কবিতায় যে ছন্দ এবং ভাষা রীতিটি ব্যবহার করেন, হুমায়ুন তাঁর আকবর কবিতায় একই ধরনের ছন্দ এবং ভাষারীতিটি ব্যবহার করেছেন। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের মারাঠাশৌর্যের পুনরুত্থান ঘটানোর মানসে শিবাজি উৎসবটি প্রবর্তন করেছিলেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। আজকের পশ্চিম ভারতের যে হিন্দু মৌলবাদ সর্বগ্রাসী চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে, বালগঙ্গাধর তিলক আপন হাতে তাঁর ভিত্‌টি পাকাপোক্তভাবে গড়ে দিয়েছিলেন। শিব সেনা বা শিবাজি সেনা বিজেপি এই সকল সাম্প্রদায়িক সংগঠনের জন্ম এবং বিকাশে তিলকের চিন্তা ভাবনা কারণ বীজ হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। সেগুলোকে কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্ত আকস্মিক ব্যাপার বলে মেনে নেয়া যায় না।

বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় টডের গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন। সেই উপন্যাসটি রাজসিংহ। ঐতিহাসিকতার বিচারে এটি বঙ্কিমে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিবেচিত না হলেও, এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের একটি, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। রাজসিংহ ছাড়া বঙ্কিম আর যে সকল ঐতিহাসিক কিংবা ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস লিখেছেন তার প্রায় সবগুলোর দৃশ্যপট বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ধারাক্রমের মধ্যেই সংস্থাপিত। টডের থেকে কাহিনী ধার করে একমাত্র রাজসিংহ উপন্যাসটিই লিখেছেন। এই রাজসিংহ উপন্যাসের দু'টি প্রান্ত। তার একটি হলো রাজপুত কাহিনী অবলম্বন করে উনিশ শতকের লেখকেরা যে সকল নাটক উপন্যাস রচনা করে আসছিলেন, রাজসিংহ উপন্যাস তাতে একটা মাত্রা সংযোজন করলেন। অন্যদিকে বাংলদেশের সীমিত পরিসরে বঙ্কিম যে সকল কাহিনী তৈরি করে আসছিলেন, সেখান থেকে বের হয়ে তাঁর কল্পনাকে ভারতের বৃহত্তর দিগন্তে প্রসারিত করলেন। বঙ্কিমের লেখাগুলো ইতিহাস নয়, জবরদখলকারী শাসক গোষ্ঠীর স্বৈরশাসনের প্রতি একটা শৈল্পিক প্রতিবাদ। তার অধিক কিছু নয়। তাঁর মধ্যে নিন্দা, মন্দ এবং ঘৃণার উপাদান ছিলো না, একথা সত্যি নয়।

বঙ্কিম জৈবিক অভিব্যক্তির বিষয়সমূহ ইতিহাসের উপাদানে পরিণত করেছেন। বঙ্কিম ভারতবর্ষের হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসকে স্বকীয় প্রতিভার মন্ত্রশক্তির বলে একটি নতুন পাটাতনের ওপর স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। সেই পাটাতনটা হলো একটি হিন্দু রাষ্ট্র। একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভারতীয় হিন্দু ইতিহাসে একটা নবতরো অভিযাত্রার সূচনা করতে পারেন। বঙ্কিমের জন্য মুশকিলের ব্যাপার ছিলো, তাঁর মনে একটি হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দল বেধেছে, অথচ তাঁকে বৃটিশের ডেপুটিগিরির চাকুরি কবুল করে নিত্য নিত্য শামলা এঁটে দপ্তরে হাজির হতে হচ্ছে এবং সাহেবদের কাছে সালাম ঠুকতে হচ্ছে। ইংরেজ শক্তিকে পরাজিত করে আপাতঃ হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব,

একথা স্বপ্ন তাড়িত বঙ্কিমও না মেনে নিতে পারেন না। তাই বঙ্কিমকে হিন্দু রাষ্ট্রের টগবগে স্বপ্ন বুকে নিয়ে অতীতের দিকে তাকাতে হয়। আটশো বছরের মুসলিম শাসনের গ্লানি আপন রক্তে শুঁষে নিয়ে তিনি অস্থির এবং উতলা হয়ে উঠেন। তাঁর মানবতাবোধ, সৌন্দর্য চেতনা এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস চিন্তা সবকিছু পরাজিত হয়, জেগে থাকে শুধু ঘৃণা। এই ঘৃণাবোধই তাঁর চিন্তার চালিকাশক্তি হয়ে বসে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে ঘৃণা একটি বড়ো ভূমিকা পালন করেছে, যা মুসলমান পাঠককে পড়া মাত্রই আহত করে। খুব সম্ভবতো মুসলমান পাঠকেরা বঙ্কিমের বইতে খারাপ কথা লেখে কেনো তার একটা জবাব পেয়ে গেছি।

আট

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের একটা চেহারা কল্পনা করে নিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রাচীনকালে আর্যরা বাইরে থেকে এদেশে এসে অপূর্ব সৃজনিশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে হিন্দু সভ্যতার ভিত্‌টা গঠন করেছিলেন। আর্য জাতির নানাবিধ কীর্তি গৌরবময় হিন্দু অতীতের স্বাক্ষর বহন করে। অনেক সময়েই বঙ্কিম হিন্দু এবং আর্য দু'টি শব্দ একই রকম ভাবার্থক বলে মনে করতেন। বঙ্কিম একা নন। উনবিংশ শতাব্দী এমনকি বিংশ শতাব্দীর অনেকেও তাঁর মতো চিন্তা করতেন। এই চিন্তাটা সঠিক নয়। ভারতীয় অধিবাসীরা হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অনেক পরে। মুসলিম শাসন পাকাপোক্ত হয়ে বসার পরেই ভারতের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। মুসলিম শাসনের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন কায়েম হয়, ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা চিন্তা ভাবনায় অগ্রসর এবং ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার সংস্পর্শে এসে যাঁদের চোখ কান খুলতে আরম্ভ করে, তাঁদের একটা অংশ একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই সুপ্রাচীন আর্য সভ্যতা সংস্কৃতির নবজীবন দান করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শ্রেণীটির নেতৃত্বদান করেছিলেন।

বাংলার নয় শুধু, সারা ভারতের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের এই অংশটি হিন্দুদের অতীত বলতেই সেই আর্য যুগের কথা স্মরণ করতেন। তাঁরা আরো মনে করতেন বাইরে থেকে মুসলমানেরা এসে ক্রম প্রবাহমান আর্য রাজত্বের ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটিয়ে ভারতের ইতিহাসে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। এই চিন্তাটিও অতিশয় প্রমাদপূর্ণ। ভারতীয় সভ্যতাকে এককভাবে আর্য সভ্যতা বলা ইতিহাসসম্মত নয়। ভারতের সমাজ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রূপায়ণে আর্য উপাদান যেমন আছে, তেমনি অনার্য উপাদানের পরিমাণও সেখানে বিস্তর। বরঞ্চ বলা চলে আর্য উপাদানের চাইতে অনার্য উপাদানের পরিমাণ অধিক। আর শুধু মুসলমান আক্রমণের ফলে আর্য সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে একথা বলাও উচিত হবে না। এদেশে মুসলমানদের আসার ঢের আগে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার তাঁর বিশ্ববিজয়ী বাহিনী নিয়ে হানা দিয়েছিলেন। গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়রা জ্ঞানে বিজ্ঞানে লাভবান হয়েছিলেন। তারপর ভারতবর্ষে শক এবং হুনেরা বারংবার আক্রমণ চালিয়েছে এবং স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে ভারতের অভ্যন্তরে অধিকার প্রসারিত করেছে। আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের কাছে এটা পরিষ্কার যে হুনদের শাসন কায়েম হওয়ার পরেই

ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি চর্চার ধারায় ছেদ পড়েছে। তার জন্য এককভাবে মুসলমানদের দায়ী করা চলে না।

বর্তমান রচনাটিতে আমি একটি তাৎপর্যপূর্ণ জিনিশ তুলে ধরতে চাই। পাটলিপুত্র থেকে গান্ধার অবধি বিস্তৃত ভূভাগ যেখানে আর্যরা চলাচল করতো, সমস্ত অঞ্চলটাকে আর্যাবর্ত ধরা হতো। গান্ধার রাজ্য আধুনিক আফগানিস্থানের সীমানার মধ্যে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র আর্য এবং হিন্দুত্ব এ দুটি বিষয়কে এক করে দেখেছেন বারবার। কিন্তু একটি বিষয় শুধু বঙ্কিম নন, আরো অনেক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিই এঁড়িয়ে গেছে। বঙ্কিম কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্মের বহু শতো বছর আগে আর্যাবর্তের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলামান হয়ে গেছেন। আধুনিক পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, সীমান্ত প্রদেশ এবং আফগানিস্থান এই সমস্ত অঞ্চল তো আযাবর্তেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সমস্ত অঞ্চলের যে সমস্ত মানুষ, যাঁরা মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা তো আর্য জনগোষ্ঠীরই একটা বিরাট অংশ। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দ যখন আর্যত্ব এবং হিন্দুত্বকে এক করে দেখেছেন, তাঁদের মনে ধর্মান্তরিত আর্যদের কথা একবারও উদয় হয়নি। হাল আমলে আফগানরা তাঁদের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থার নাম রেখেছেন আরিয়ানা আফগান ওয়ার লাইনস বাংলা করলে যা দাঁড়ায় আর্য আফগান এয়ার লাইন। রাজধানী কাবুলের প্রধান আকর্ষণীয় এলাকার নাম রেখেছেন আরিয়ানা স্কোয়ার অর্থাৎ আর্য চত্বর। এই সমস্ত নামকরণের মধ্য দিয়ে আফগানেরা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁরাও আর্য গৌরব এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ধারণ করে আছেন। এইভাবে সিন্ধী, পাঞ্জাবী এবং সীমান্তের পাঠানেরা একই রকমভাবে আর্য উত্তরাধিকার দাবি উত্থাপন করতে পারেন। সুতরাং ভারতের হিন্দুরাই আর্য ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে না, আর্যাবর্তের মুসলিম প্রধান প্রদেশসমূহের মুসলমানেরাও একই রকম দাবি করতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু চিন্তানায়কদের বেশিরভাগই আর্যত্ব এবং হিন্দুত্ব এক করে দেখার জন্য এক রকম আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন।

ভারতবর্ষের অতীত বলতে হিন্দু চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ আর্যযুগ বোঝাতেন। ভারতবর্ষের অতীত রাজন্যবর্গের সকলে অবিমিশ্র আর্যবংশোদ্ভূত ছিলেন এ কথাও সত্যি নয়। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের অনেকটাই আর্য-অনার্যে সংঘাতে পরিপূর্ণ। অনার্যেরা সকলে কৃষ্টি-সংস্কৃতিহীন অসভ্য ছিলেন, সেটা একেবারে অসত্য। ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সমস্তটা আর্যদের একচেটিয়া এই প্রবল মত উনবিংশ শতাব্দীতে এতোদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, তা হিন্দু সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অনুধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছিলো।

আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। লিচ্ছবি বংশোদ্ভূত গৌতম বুদ্ধ বেদ ব্রাহ্মণের অসারতা প্রমাণ করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রথা চালু করেছিলেন। জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ বংশ

পরিচয়ের দিক দিয়ে দু'জনের কেউই আর্য জনগোষ্ঠীর অংশ ছিলেন মনে হয় না। তথাপি একথা অবিসংবাদিত যে দু'জনের ধর্মমত ভারতবর্ষের জনসমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। আচারের কড়াকড়ির কারণে জৈন ধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন গৃহিত হয়নি। তাই একটা বিশেষ জনগোষ্ঠির বাইরে মহাবীরের ধর্মমত বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমতের কথা স্বতন্ত্র। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রচারিত ধর্ম ভারতবর্ষের জনসমাজ এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করেছিলো। প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত কীর্তির কথা স্মরণ করে অনেকে শ্লাঘা অনুভব করতেন, তার একটা বিরাট অংশ বৌদ্ধরাই স্থাপন করেছেন। অনেকেই এ জিনিশটি ভুলে থাকতে পছন্দ করতেন।

এই ব্যাপারটি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও ঘটেছে। তিনি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক বুদ্ধদের নামও শুনতে পারতেন না। কিন্তু অবলীলায় অজন্তা ইলোরাসহ সকল বৌদ্ধ পুরাকীর্তিকে হিন্দু তথা আর্য গৌরবের স্মারক হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁর মোটেও আপত্তি ছিলো না। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটা অপব্যাখ্যা তাঁর মন-মানসে এমন আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করেছিলো, মনে করতেন ভারতের অতীত ইতিহাসের সমস্ত আয়তনটাই আর্য কীর্তি এবং গৌরব দিয়ে ঠাসা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরুত্থানের পর ভারত জুড়ে বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছিলো, তাদের বিহার এবং উপসনালয়সমূহ যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, অথবা হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা হয়েছিলো এবং যে সকল কারণে বৌদ্ধ ধর্ম আপন জন্মভূমি থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়ে গেলো, এগুলোকে বঙ্কিম এবং তাঁর সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ইতিহাসের অংশ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এতো অত্যাচার অনাচার ঘটেছে, বঙ্কিম তার অধিকাংশের জন্যই মুসলমান বিজেতাদের দায়ী মনে করতেন; যেনো মুসলিম রাজত্বের পূর্বে আর্যযুগে শুধু দুধ মধুরধারা প্রবাহিত হতো এবং হিমালয়ের শীর্ষ থেকে দলে দলে দেবতারা নেমে এসে আশিষধারা বিতরণ করতেন। টড রাজস্থানের ওপর লেখা গ্রন্থটা প্রকাশ করে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দুর সামনে স্বপ্ন ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। হিন্দু লেখকেরা দেদার আর্যগৌরবের নিদর্শন এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা থেকে আহরণ করে এমন সব উপন্যাস, ইতিহাস, নাটক এবং কাব্য রচনা করতে লেগে গেলেন, সেগুলোই সাধারণ পাঠকের কাছে গরীয়ান অতীতের অভিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলো। সেকালের রাজপুত বীর এবং বীরাঙ্গনাবৃন্দ আর্য শৌর্যবীর্যের প্রতীক হয়ে সকলের চোখে দেখা দিতে আরম্ভ করলেন। এই রচনায় অন্যত্রও এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে, এই রাজপুতরা কারা? তাঁরা কি আর্যদের কেউ ছিলেন, তাঁদের ধমণীতে আর্য শোণিত কি প্রবাহিত ছিলো? ইতিহাসের জবাব হলো রাজপুতেরা ছিলেন হুনদের বংশধর। এই হুনদের আরেকটি শাখা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে রক্তপাত, হত্যা এবং ধ্বংসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলো। যে শাখাটা ভারতে প্রবেশ করেছিলো তাঁদের কীর্তিও কম মহত্বের দাবিদার নয়। তারা ভারতীয় সভ্যতা এবং

সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরও ভারতীয় হিন্দু কৃতবিদ্য সমাজের একটি বিরাট অংশ রাজপুতদের অর্থে গায়ে আঙরাখা চাপিয়ে হাজির করতে থাকেন, তার কারণ উপনিবেশিক শাসকদের ভেদনীতি, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগা পরাধীন হিন্দুর বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তি, খণ্ডিত ইতিহাস চেতনা অনেক কিছুর মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সূচনাটি করেছিলেন, আনন্দমঠ উপন্যাসে। এই রচনাতেই বলা হয়েছে "আনন্দমঠকে যদি কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে ডাস ক্যাপিটালের সঙ্গে তুলনা করতে হবে কৃষ্ণচরিতকে"। কৃষ্ণচরিতে অবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন, যাতে করে একটি ধর্ম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবমূর্তি সাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

সেই পুরোনো প্রসঙ্গটি আবার নতুন করে অবতারনা না করে উপায় নেই।বৃটিশ শাসনের সূচনা পর্বে বঙ্গদেশে সন্ন্যাসী এবং ফকিররা মিলেমিশে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখালেন সন্ন্যাসীরা একাই বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সেখানে ফকিরদের মোটেই অংশগ্রহণ নেই। বঙ্কিম প্রকৃত ইতিহাস জানতেন না, তা ঠিক নয়।বঙ্কিমচন্দ্র জেনে শুনে ইতিহাসের এই বিকৃতি সাধন করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন, নিজে হিন্দুর জন্য আলাদা এক প্রস্থ ঐতিহাসিক যুক্তি নির্মাণ করেছেন। সেগুলো সবই অসার এবং ভিত্তিহীন। তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের লড়াই থেকে একটি আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের উথান ঘটাতে চেয়েছেন। আসলে সন্ন্যাসীদের লড়াইয়ে ফকিররাও ছিলেন। তিনি তাঁদের কথা বেমালুম চেপে গেছেন। তারপর শ্রীকষ্ণকে আধুনিক হিন্দুদের রাষ্ট্রগুরু হিসেবে দাঁড় করাতে গিয়েছেন। তা করতে যেয়ে কৃষ্ণচরিতকে একটা অলীক ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হয়েছে। তারপর ভারতীয় হিন্দুর অতীত নির্দেশ করতে গিয়ে আর্য যুগের একটা সোনালী ছবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আর্যদের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি সব সময়ে বর্তমান ছিলো না। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও একটা দীপ্ত ধারার সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, বঙ্কিম নিজের দাঁড় করানো তত্ত্বের প্রয়োজন ছাড়া বৌদ্ধদের কোনো প্রসঙ্গই উথাপন করেননি। বঙ্কিম আর্যত্ব এবং হিন্দুত্ব এই দু'টি শর্ত অনেক সময়ে এক করে দেখেন। বঙ্কিমের জন্মের শতো বছর পূর্বে আর্যাবর্তের জনসমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও আর্য গৌরবের দাবিদার; সেই জিনিশটি বঙ্কিমের মনে একবারও উদয় হয়নি। রাজপুতদের আর্যত্বের গৌরব দান করে বঙ্কিম প্রমাণ করলেন, ইতিহাসের ওপর একটা স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত ধারণাই তিনি আরোপ করেছেন।

আমি এই নাতিক্ষুদ্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস বিচারের ত্রুটিসমূহ একের পর এক শনাক্ত করতে চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে, এই ভ্রান্ত ইতিহাস বিচারের

পদ্ধতি অনুসরণ করার দায় দায়িত্ব সবটা বঙ্কিমের ওপর আরোপ করাটা ঠিক হবে না। বৃটিশের ভেদনীতির একটা ভূমিকা অবশ্যই কবুল করে নিতে হবে। বঙ্কিমের যুগটির কথা একেবারে ভুলে গেলেও চলবে না। গোটা যুগের চেহারাটা আর্য গৌরবে মুখরিত এবং মুসলিম নিন্দায় ভরপুর। বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব প্রতিভা বলে যুগ চেতনাকে একটি নতুন ইতিহাস বিনির্মাণের ধারাক্রমের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। এটুকুই বঙ্কিমের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত ধারণাকে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন তার জন্য হিন্দু সমাজ তাঁকে ঋষির আসনে বসিয়েছিলো। অতীতের কুয়াশা কুহেলির আড়াল ঠেলে সে প্রতীতিসমূহ নতুন করে বিচার করলে মনে হয়, সেগুলো মরা জন্তু জানোয়ারের কঙ্কাল, সময়ের উষর মরুর এক নিভৃত প্রান্তে মানব অহমিকার নিদর্শন হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যে প্রাণ ও জীবনধারার কোনো সংযোগ নেই। তথাপি এটা কি জ্বলন্ত বাস্তবতা নয় যে বঙ্কিমের হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন উত্তর পশ্চিম ভারতে হানা দিয়ে আতঙ্ক এবং অন্ধত্ব বিস্তার করে যাচ্ছে।

নয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের চাইতে বিদ্যাবুদ্ধিতে কতো দূর অগ্রসর ছিলেন, কি রকম স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, চিন্তা করলে বিস্মিত না হওয়ার উপায় থাকে না। বাঙ্গালার কৃষক রচনাটি তিনিই লিখেছিলেন। বাংলার কৃষক সমাজের দুর্দশার কথা তাঁর মতো এমন আবেগ অনুভূতি নিয়ে তাঁর সময়ে কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরেও কোনো বাঙালি লেখক লিখতে প্রয়াসী হননি। প্রমথ চৌধুরীর লেখা রায়তের কথার সঙ্গে বঙ্কিমের রচনাটির কিছুটা মিল হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা অনেক পরের ঘটনা। তারপরেও বঙ্কিমের রচনাটির ছত্রে ছত্রে যে অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে তুলনা করলে প্রথম চৌধুরীর রচনাটিকে মনে হবে বয়ানধর্মী। বঙ্কিম গ্রামীণ অর্থনীতির অন্ধিসন্ধি সম্পর্ক যেভাবে ওয়াকেবহাল ছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর সে রকম পারঙ্গমতা ছিলো বলে মনে হয় না।

বঙ্কিম যে সময়ে সাম্য রচনাটি লিখেছিলেন এই একই বিষয়ে এই রকম আরেকটি রচনা লেখার মতো যোগ্য ব্যক্তি তামাম ভারতবর্ষে সন্ধান করলে একজনও পাওয়া যেতো কিনা সন্দেহ। তৎকালীন ইউরোপেও সাম্যবাদী চিন্তা বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি। বঙ্কিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজচিন্তার সঙ্গে কতোদূর ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন, এই রচনাটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বঙ্কিম পরবর্তী যে সকল ব্যক্তি সাহিত্য এবং সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে নায়কতার ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের কারো মধ্যেই বঙ্কিমের অনুসন্ধিৎসা এবং দুঃসাহসের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে বঙ্কিমের বিশদ ধারণা ছিলো। বিজ্ঞান রহস্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহে আধুনিক বিজ্ঞান এবং কৃত কৌশলের অগ্রযাত্রার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়বোধ প্রকাশ করেই বঙ্কিম সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলকে সাবালক মানব মস্তিস্কের উপজাত ফসল হিসেবেই দেখেছিলেন। বাঙ্গালির অলস মস্তিস্কের তার্কিকতার প্রবণতা এবং চিত্তবৃত্তির উন্মার্গগামীতা এই সকল চারিত্র্যলক্ষণকে সুযোগ পেলেই তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। পশ্চিমা জাতিগুলো বিজ্ঞান সাধনার বলেই সমস্ত পৃথিবীকে তাদের শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করেছে, একথা বঙ্কিম অনেকবারই দ্বিধা এবং জড়িমাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

বঙ্কিমের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণাও ছিলো অত্যন্ত স্বচ্ছ। যে কোনো জাতির ইতিহাস সে জাতির সর্বাঙ্গীন পরিচয়কে ধারণ করে। তাঁর বাঙ্গালার ইতিহাস এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র

প্রবন্ধটিতে যে বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের পরিচয় মেলে, তা থেকে তাঁর ইতিহাস বিচারের ধরনটি অনুমান করা যায়। ইতিহাস বলতে বঙ্কিম যথার্থ অর্থে জনগণেরই ইতিহাস বুঝতেন। জনগণই ইতিহাসের আসল স্রষ্টা। ইতিহাস রাজ রাজরাদের নামের তালিকা নয়, কিংবা এক বংশ থেকে অন্য বংশের লোকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিবরণও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধে ইতিহাসের গতিধারার প্রতি যে ধরনের ইঙ্গিত দান করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা অদ্যাবধি অবসিত হয়নি। তিনি কবুল করে নিয়েছেন, বাঙালি একটা মিশ্র জাতি। বাঙ্গালির ইতিহাস মানে ওই মিশ্র জাতিরই ইতিহাস। আর্য, অনার্য, বিদেশাগত জনগোষ্ঠি এবং প্রান্তিক জনসমাজ সকলেরই ইতিহাস। সব বৃত্তির, সব পেশার, সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের ইতিহাসই বাঙালির ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে মুসলমান বিজেতাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁদের পররাজ্য লোভী তস্কর, প্রজাপীড়ক, পরধর্ম বিদ্বেষী এবং লুণ্ঠনকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন, তেমনটি অন্য কোনো লেখক করেননি। তথাপি তিনি বিজেতাদের সামরিক শ্রেষ্ঠতার প্রশংসা করেছেন। সুলতান মাহমুদ যে একজন দক্ষ সেনাপতি এবং বিচক্ষণ রণপণ্ডিত ছিলেন স্বীকার করে নিতে কোনো রকম কুণ্ঠা প্রদর্শন করেননি। আক্রমণকারী মুসলমান রাজাদের তুলনায় সামরিক শক্তির দিক দিয়ে ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গ অপেক্ষাকৃত হীনবল ছিলেন এবং তাঁদের সামরিক সংগঠন দুর্বল ছিলো, ওগুলো বঙ্কিম অম্লানবদনে কবুল করে নিয়েছেন। তাঁর জানাশোনার পরিধি এতো দূর প্রসারিত ছিলো যে তিনি পৃথিবীর বড়ো বড়ো জাতিগুলোর উথান পতনের ইতিহাস এবং কারণ জানতেন। একেকটি জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে নৈতিক শক্তির কি ভূমিকা, সঙ্ঘশক্তির কি পরিমাণ বেগ এবং আবেগ প্রয়োজন, সে বিষয়ে বঙ্কিম বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। বঙ্কিম যখন তাঁর ধর্মতত্ব গ্রন্থটিতে উচ্চারণ করেন, তিনি যে ধর্মবলের কথা বলছেন, সেই বলে বলীয়ান হয়ে উঠলে ভারতবর্ষের হিন্দুরাও হজরত মুহম্মদের সময়ের আরব এবং ক্রমওয়েলের সময়কালীন ইংরেজদের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তা থেকে বঙ্কিমের ইতিহাস বীক্ষার সঠিক পরিচয়টি বেরিয়ে আসে।

বঙ্কিমের প্রাগ্রসর সম্মুখ দৃষ্টি, ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা, তৎকালীন ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং বিজ্ঞান মনস্কতা এতো সব যোগ্যতা এবং পারঙ্গমতা, সেগুলোর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর দেশ এবং সমাজের সামনে একটি ভিন্ন রকম জাতীয় এবং সামাজিক আদর্শের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু বঙ্কিমকে পরিচিত হতে হলো হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা আনন্দমঠ গ্রন্থের বন্দে মাতরম মন্ত্রের ঋষি হিসেবে। এই ট্র্যাজেডি একা বঙ্কিমের নয়। এটা ভারতীয় সমাজের ট্রাজেডি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিম ছিলেন বৃটিশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অধিকতর যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা সত্বেও তাঁর কোনো পদোন্নতি ঘটেনি। যতোদিন চাকুরি করেছেন, তাঁর চাইতে অযোগ্য এবং অপদার্থ ব্যক্তিদের তাঁকে সালাম ঠুকতে হয়েছে। উপনিবেশিক শাসনের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো গুণ

এবং যোগ্যতা থাকা সত্বেও শাসিত জাতির মানুষ উচ্চতর পদ লাভ করতে পারে না। উপনিবেশিক শাসন ব্যক্তিকে যেমন খণ্ডিত করে, তেমনি তার চিন্তা ভাবনারও বিকলাঙ্গ একপেশে বিকাশ ঘটাতে বাধ্য করে। বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও সেই জিনিশটি হয়েছিলো। তিনি মনে মনে হয়তো একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের চেহারাটি একটি হিন্দু রাষ্ট্রের মোড়কে প্রকাশ করতে হয়েছিলো।

প্রসঙ্গতঃ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের সেই সব গনগনে তরুণ তুর্কী যুবকদের কথা বিবেচনায় আনতে পারি। হেনরী ডিরোজিয়োর মন্ত্রশিষ্য এই সকল তরুণ যৌবন বয়সে সব ধরনের হিন্দু সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য ব্যগ্র এবং উতলা হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং প্রমাণ্য কিছু আছে এই তরুণেরা বিশ্বাস করতেন না। পশ্চিমই ছিলো তাঁদের ধ্যান জ্ঞান। পশ্চিমা ধাঁচের জীবন চর্চা আয়ত্ব করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। দেশীয় চিন্তা চেতনার প্রতি তাদের উষ্মা এবং বিরক্তি এতোদূর চরমে উঠেছিলো যে গো-মাংস ভক্ষণ করে নিছক মজা দেখার জন্য হাড়গোড় নিষ্ঠাবান হিন্দুদের বাড়ির আঙ্গিনায় ছড়িয়ে দিতেন।

পরিণত জীবনে এই ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের ভাব বিপ্লবের মশালচিদের মধ্যে কি রকম পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো, সেটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। এই তরুণদের অনেকেই সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের তরুণেরা যে আত্যন্তিক যত্ন সহকারে পশ্চিমা বিদ্যা রপ্ত করার জন্য বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; সেই জ্ঞান বিদ্যার সদ্ব্যবহার করার জন্য তাঁদের প্রায় সকলকেই বৃটিশের চাকুরি গ্রহণ করতে হয়েছিলো। বৃটিশের বেতনভোগী একজন কর্মচারীর যে স্বাধীনতা, সেটা হলো সাধু হওয়ার স্বাধীনতা। সমাজ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ব্যক্তির অন্তঃস্থ সত্তাকে একটা সময়হীন শূণ্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করার অপর নামই তো সাধুর খাতায় নাম লেখানো।

ডিরোজিয়ো শিষ্যদের বিদ্রোহের আগুন, হাওয়ার আতশবাজির মতো ফুর ফুর করে জ্বলে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেছে। বৃহত্তরো সমাজে তাঁদের সমাজচিন্তা, দর্শনচিন্তা দাবানল জ্বালিয়ে তোলার কথা দূরে থাক, ডিরোজিয়ানরা নিজেরাও যৌবন দিনের সেই উত্তাপ, সেই অঙ্গীকার বুড়ো বয়স পর্যন্ত ধারণ করতে পারেননি। ব্যর্থ বিদ্রোহীকে একটা শাস্তি অবশ্যই ভোগ হরতে হয়। সেই শাস্তি রাজার তরফ থেকে আসুক কিংবা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হোক। যে সকল তরুণ একদা প্রাণের উত্তাপে সমাজ সংসারের সমস্ত বন্ধন উপড়ে ফেলে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর শেষ পর্যন্ত সাধু বনে গিয়ে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করার দশায় উপনীত হয়েছেন, এরকম একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে হলো। সাধুরা নিরঙ্কুশ স্বাধীন, কারণ সমাজ সংসারের কোনো সম্পর্ক তাঁদের স্বীকার করতে হয় না। সাধুত্বের নির্মোক তাঁদের দুনিয়াদারির ঝড়-ঝাপটা থেকে অলাদা করে রাখে। বৃটিশের পেনসনভোগী এই সকল ব্যর্থ বিদ্রোহী

সাধু স্বাধীনতার একটা তুরীয় মার্গে অবস্থান করতে থাকলেন। হ্যাঁ, এক ধরনের স্বাধীনতা বটে। এটা অতীত দিনের নিজেদের আপন বিষ্ঠার ওপর পরমানন্দে শুয়ে থাকার স্বাধীনতা। উপনিবেশিক বৃটিশ সরকার এটুকু স্বাধীনতাই বিদ্রোহীদের জন্য মঞ্জুর করতে পারে।

বঙ্কিমের পক্ষে সাধু হওয়া অসম্ভব ছিলো। তাঁকে হতে হয়েছিলো ঋষি। কারণ তাঁর মতো এমন একজন সবল কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সমস্ত বন্ধনহীনতার তুরীয় মার্গে আরোহণ করা অসম্ভব। তাঁর চিত্তবৃত্তিতে অধিকতরো কঠিন এবং ভারি উপাদান সঞ্চিত ছিলো। ধর্মকে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় কবুল করে নেয়ার পরও সমাজ সংসার ভুলে যাওয়া বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং তিনি সমাজ সংস্কারের সমস্ত কিছুকে ধর্মের নিরিখে বিচার করতে আরম্ভ করলেন। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে বঙ্কিমকে ঘোষণা দিতে হলো, বিদেশের উৎকৃষ্টতরো বিজ্ঞানটির চাইতে স্বদেশের স্বজাতির তুচ্ছতম সংস্কারটি অনেক ভালো।

চাকুরি জীবনে বঙ্কিমের লাঞ্ছনা, পারিবারিক দুর্যোগ, একমাত্র কন্যার অকালে অপঘাত মৃত্যু বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনকে হতাশায় এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিলো; একমাত্র ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা সন্ধান করতে হয়েছিলো। তরুণ বয়সের সাধনা বলে বঙ্কিম চিন্তা করার যে অপূর্ব ক্ষমতা আয়ত্ব করেছিলেন, সেই জিনিশটিকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করতে বাধ্য হলেন। বঙ্কিমের জীবনচরিত পাঠক তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগ উত্থাপন করার পরও দুঃখবোধ না করে পারবেন না। আহা! কি আশ্চর্য মানুষ। কি করতে পারতেন, আর কি করলেন।

দশ

আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর এই নাতিদীর্ঘ রচনাটি লেখা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, সেই সময়ে ভেতর থেকে তাগাদা অনুভব করতে থাকি, একই রচনায় আমাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্র-সাহিত্য পঠনপাঠন এবং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে আমি অনেকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বঙ্কিমের প্রভাব অধিকতরো গভীর এবং বাঙালি সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে বঙ্কিমের অধিকতরো প্রভাব রাখতে পেরেছেন। অদ্যাবধি সেই ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তারপরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে যে একটা মঙ্গলকর ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন সেই জিনিশটিরও সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে সঠিকভাবে শনাক্ত হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের দেয়া কৈফিয়ত দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি বলেছিলেন, আমি যখন সাহিত্য রচনা করতে এসেছি বাংলা সাহিত্যে তখন রাজপুতনার যুগ চলছে। ওপরের বাক্যের বক্তব্যটা রবীন্দ্রনাথের, ভাষাটা আমার। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের অজানা থাকার কথা নয়। টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে কাহিনী আহরণ করে তাঁর বড়ো বোন স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামতের অনেক অমিলের সংবাদও অনেকে জানেন। এই মতানৈক্যের মূল কারণ আদর্শগত। টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে কাহিনী চয়ন করে উপন্যাস, আখ্যায়িকা, নাটক এবং কাব্য রচনার ধুম পড়ে গিয়েছিলো উনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতে এসেও তার ঢেউ থামেনি। স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ঠাকুর বাড়ির প্রতিভাবান পুত্র-কন্যারাও রাজস্থানে আর্য গৌরব আবিস্কারে বিরত ছিলেন না। আর্য গৌরব মানে হিন্দু গৌরব। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানী বাংলার ইতিহাসে হিন্দু মহিমা সন্ধান করতে গিয়ে প্রতাপাদিত্যের সাক্ষাত পয়েছিলেন। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে প্রতাপাদিত্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার জন্য প্রতাপাদিত্য উৎসব চালু করেছিলন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য উৎসবের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য যে আসলে একজন স্বৈরাচারী রক্তপিপাসু শাসক সে সব বিষয় বাখান করে প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মও উনবিংশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নানামুখী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে, ঠাকুর পরিবার তার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে যে ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন জন্ম নিয়েছিলো ঠাকুর পরিবার তাতে একটি প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। রামমোহনের অবর্তমানে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাণ্ডারি হিসেবে ব্রাহ্ম সমাজের হাল ধরেছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাব এবং ব্রাহ্ম সমাজের উত্থান তো উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণের ফসল। একটা সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্ম সমাজ এবং ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

অতীত ভারতের মহিমা পুনরুদ্ধার করে নতুন ভারত নির্মাণের প্রাথমিক প্রয়াস ঠাকুরবাড়ি থেকেই স্ফুরিত হয়েছিলো। রাজনারায়ণ বসুর পুনর্জাগরণমূলক রচনা বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রথম ঠাকুর বাড়ির উৎসাহেই লিখিত হয়েছিলো। ঠাকুরবাড়ির লোকদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আর্থিক সহায়তায় হিন্দুমেলার আয়োজন সম্ভব হয়েছিলো। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু মেলাকেই ধরা হয় ভারতীয়দের উদ্যোগে সংঘঠিত একটা রাজনৈতিক সামাজিক সঙ্কট সম্ভাবনা বিচারের সার্বজনীন মঞ্চ। এই হিন্দু মেলাতে কবিতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসমক্ষে কবি পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলি সব, ভারত সন্তান, গাও গান ভারতের যশোগাথা; এই গানটি রচনা করেছিলেন। সে একটা সময় যখন ভারতের জনগোষ্ঠীর জাগরণ বলতে হিন্দু জনগোষ্ঠীরই জাগরণ বোঝাতো। এই হিন্দু জাগরণের প্রাথমিক উত্তাপের আঁচ যে রবীন্দ্রনাথের গায়েও লাগেনি সে কথা ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী। তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের ভূমিকা পালন করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও স্বল্প সময়ের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ছিলেন। যদিও ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে হিন্দু সমাজের সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি, তথাপি হিন্দু সমাজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একটা সামাজিক সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করতেন, ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের অবদানে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। রুচি সংস্কৃতির বিকাশে ব্রাহ্ম সমাজ যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা বঙ্কিমের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মের প্রতি বঙ্কিমের ছিলো অনুরাগ এবং প্রশ্রয়। আর রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিম প্রতিভার বিরাটত্ব এবং মহত্বের প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তারপরেও কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্ম সমাজ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে প্রায় অপ্রীতিকর বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে কুণ্ঠিত হননি। বঙ্কিম প্রচারিত হিন্দু আদর্শটি থেকে রবীন্দ্রনাথ কতোদূরে সরে এসেছিলেন, সে বিষয়ে একটা ধারণা দেয়ার জন্য পেছনের কথাগুলো বলা হলো। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম এবং কবি চিত্তের মুক্ততা এ দুটোর মধ্যে কোনটা তাঁকে হিন্দুত্বের মুগ্ধতা থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এসছিলো বলা মুশকিল। খুব

সম্ভব কবিচিত্তের মুক্ততাই এজন্য দায়ী। তাঁর আপন ভাই বোন এবং পরিবারের মানুষেরা আর্য তেজের উত্তাপে যখন ফুলকো লুচির মতো ফুলে ফুলে উঠছেন, সেই সময়েও দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ সবল কাণ্ডজ্ঞানের ওপর ভরসা করে পারিবারিক সংস্কারের বলয় ভেদ করে জোরের সঙ্গে পথ কেটে বেড়িয়ে আসছেন। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সামাজিক বৃত্তটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কখনো স্বেচ্ছায় ধরা দেননি। বরাবরই বাইরে থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অপরিসীম সৃষ্টিশক্তি এবং কল্পনাবৃত্তির শুদ্ধতা বার বার তাঁকে একটি মানবিক আদর্শ সন্ধান করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একটা মুগ্ধ বিস্ময়বোধ রবীন্দ্রনাথের সব সময়েই ছিলো, কিন্তু কোনো প্রাচীন আঁটোসাঁটো ধর্মীয় আদর্শের মধ্যে আত্মসমর্পন করার কথা রবীন্দ্রনাথ একবারও চিন্তা করেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ওপর অনেক বেশি আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কারণ উপনিষদের মধ্যে ডগমা বা বদ্ধচিত্ততার কোনো স্থান নেই। উপনিষদের বাণী চিত্তকে সঙ্কীর্ণ, বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে না, বরং মানুষের সত্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি তীক্ষ্ম করে। ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা সহজাত অন্তর্দৃষ্টি ছিলো। অন্তর্দৃষ্টি মাত্র অধিক কিছু নয়। ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত যে সকল মতামত তিনি প্রকাশ করেছেন, একজন ঐতিহাসিক সেগুলো যথার্থ বলে মেনে নিতে রাজি হবেন না।

যা হোক, আমাদের আসল বিষয়টিতে ফিরে আসি। উপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজের ব্যবধান দুস্তর পারাপারের আকার ধারণ করেছে। প্রবল সমাজের আদর্শ দুর্বল সমাজের আদর্শটিকে ঁটুটি টিপে ধরতে উদ্যত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিভেদাত্মক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন রকম একটা মানবিক আদর্শ খাড়া করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের কথা যখনই এসেছে তিনি বার বার বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ করেছেন। বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে কবিতা, নাটক এবং গীতিনাটক রচনা করেছেন। মারমুখী হিন্দু সমাজ আদর্শের প্রতাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সন্ত কবীর এবং বাউল দর্শন আঁকড়ে ধরে তাঁর ভিন্ন রকম আবস্থানটি নানাভাবে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। সমাজ সংস্কৃতির যে স্তরসমূহ উপনিবেশিক শাসনের নির্মম পীড়নে বিকলাঙ্গ আকার ধারণ করেনি, রবীন্দ্রনাথ বার বার সেই সমস্ত স্তর থেকে শক্তি সঞ্চয় করে একটি সমান্তরাল সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় জনগণের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিলো অনেকটা প্রতীকী ধরনের। রাজনীতির প্রভাব এড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজনীতির সঙ্গে লেগেও থাকতে পারেননি। তাঁকে সরে আসতে হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি এবং অঙ্গীকার ছিলো সমাজের প্রতি। উপনিবেশিক শোষণের যাঁতাকলে পৃষ্ঠ হয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের ভারে প্রপীড়িত, অশিক্ষা, কুসংস্কারের অসহায় শিকার। কিন্তু তারা কোনো পর্যায়ে উপনিবেশিক সরকারের শোষণ প্রক্রিয়ার সহায়তা করেনি। ভারতের মধ্যশ্রেণীভুক্ত

রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিলো, তাঁদের উত্থান ঘটেছে উপনিবেশিক শাসনের পাটাতনে। উপনিবেশিক শাসকদের শোষণের ফলে সৃষ্ট সেই কেন্দ্রবিন্দু যা শক্তি সঞ্চয় করে বৃটিশ শাসনের বিরোধিতা করতে লেগেছে, সেখান থেকে অনেক দূরে গ্রামীণ কৃষক সমাজে তার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করে উপনিবেশিক পাটাতনের একটি বিকল্প পাটাতন নির্মাণ করে দেশকে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। খুব সম্ভবতো মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইখানেই দৃষ্টিভঙ্গীগত বিরোধের সূচনা। মহাত্মা গান্ধীও গ্রামীণ সমাজের প্রতি অঙ্গীকারসম্পন্ন ছিলেন। তিনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বহুগুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যটি অনেকটা এরকম।

মহাত্মা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাহায্যে শহুরে মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক সংগ্রামটি জয়যুক্ত করতে চাইতেন। তিনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংগ্রামের কনিষ্ঠ শরিকে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সাফল্য অভাবনীয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর মহাত্মার প্রভাব মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করেছে। ভারতের বৃটিশ বিরোধী রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠার উৎস এইখানে। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সংগ্রামের চাইতে গ্রাম সমাজকে নতুনভাবে গঠন করতে চাইতেন এবং একাজে শহরের মানুষকে টেনে আনতে প্রয়াসী ছিলেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টি বলে তিনি অনুভব করেছিলেন, উপনিবেশিক প্রভাবদুষ্ট পাটাতনের বিকল্প একটি পাটাতন নির্মাণ করতে না পারলে স্বাধীনতা স্বরাজ ওগুলো একেকটা কাগুজে শব্দের অধিক কোনো তৎপর্য বহন করবে না।

গ্রাম সমাজ পুনর্গঠন, গ্রামীণ দারিদ্র্যদূরীকরণ, গ্রাম উন্নয়ন ইত্যাদি যে সকল শব্দ হরহামেশা শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ কতো আগে সে সবের সূচনা করেছিলেন, চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার আলোকে উপনিবেশিক পাটাতনের বাইরে আরেকটি পাটাতনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন, গ্রাম সমাজ পুনর্গঠন, গ্রামোন্নয়ন ওসব কাজ শুরু করতে তাঁকে খুব বেগ পেতে হয়নি। একটা মানসিক প্রস্তুতি তাঁর বরাবরই ছিলো। আর তাঁর সে সুযোগও ছিলো।

উপনিবেশিক পাটাতনের বাইরে আরেকটি মানসিক অবস্থান আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ মতো বিপুল হয়ে উঠতে পেরেছিলো। তাঁর গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, শান্তিনিকেতন আশ্রম তৈরি, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা এগুলো নিশ্চয়ই তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ। বঙ্কিমের অভীষ্ট ছিলো একটি হিন্দু রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশিক সমাজের বদলে একটি স্বদেশী সমাজ সৃষ্টি করাই ছিলো লক্ষ্য ।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে গেছে বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের অগগ্রতিতে তাঁর ভূমিকা নিতান্তই সামান্য। যেটুকু

তাও প্রতীকী। রাজনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে বঙ্কিমের যে অনপনেয় প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি তার বিরোধিতা করেননি। অনুভূতির ক্ষেত্রে ভাষারীতির প্রবর্তনের ক্ষেত্রে, রুচির পরিশুদ্ধতা সাধনের ক্ষেত্রে, বিশ্বমানবিকতার উদ্বোধনের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের বিচরণ। কোনো কোনো মহল থেকে রবীন্দ্রনাথকে বৃটিশের ধামাধরা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা, বোধকরি এটিই তার কারণ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত আয়ুষ্কালটা উপনিবেশিক শাসনামলের মধ্যদিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। উপনিবেশিক চিন্তাচেতনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে ছাপ ফেলেনি একথা সত্যি নয়। অনেকের বিচারে গোরা শুধু রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসসমূহের একটি। সমস্ত উপন্যাসটাই উপনিবেশিক পাটাতনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। গোরা চরিত্রটিকে অনেকে ভারতবর্ষের জনসমাজের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্ন উঠবে গোরাকে যদি যথার্থই ভারতবর্ষের জনসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়, রবীন্দ্রনাথ আইরিশ পরিবারে তাঁর জন্ম দিলেন কেনো? কোনো ভারতীয় পরিবারে গোরার জন্ম হলো না কেন? রক্ত মাংসের উপাদানে যিনি ভারতীয় নন, তিনি ভারতের জনগণের মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণ করে বসেন। পূর্বাপর চিন্তা করে দেখলে ব্যাপারটা তেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না। নিবিষ্ট পাঠকের মনে হবে সিস্টার নিবেদিতাকে পুরুষ চরিত্রে রূপান্তরিত রূপে গোরাকে সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন। তাঁর জীবন এবং চিন্তা চেতনায় এক প্রান্ত উপনিবেশিক পাটাতনের মধ্যেই প্রোথিত। কিন্তু অন্য প্রান্ত একটা সমান্তরাল বিপরীত পাটাতনের সন্ধান করেছে।

এগার

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ীত্ব লাভ করার মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজে একটা বড়োরকম ভাঙচুর চলতে থাকে। মুসলিম অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা ছিলেন শাসক নেতৃশ্রেণীর অংশ, তাঁদের অবস্থা ভীষণ রকম শোচনীয় হয়ে পড়ে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার তাঁদের না ছিলো মানসিকতা, না ছিলো যোগ্যতা। সিপাহী যুদ্ধের অবসানের পর যে মুষ্টিমেয় অভিজাত কোনো প্রকারে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে নতুন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অবস্থান নির্মাণের চেষ্টা করে আসছিলেন, বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না। পশ্চিমা শিক্ষা লাভ করে ইংরেজ সরকারের আমলাতন্ত্রে স্থান করে নেয়া হয়তো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁরা সযত্নে সাধারণ জনগণের সম্পর্ক পরিহার করে চলতেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় কথাও বলতেন না। উর্দু ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মুসলিম সমাজের এই অংশ থেকেই সৈয়দ আমির আলি, নওয়াব আব্দুল লতিফ এই সকল ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। সৈয়দ আমির আলি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাদি রচনা করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর মনীষা সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে কোনো রকম অনুপ্রেরণা, কোনো রকম প্রণোদনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তারপরেও একথা সত্যি যে সৈয়দ আমির আলির মতো এরকম প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ তৎকালীন হিন্দু সমাজেও অধিক ছিলেন না। নওয়াব আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজের প্রয়োজন এবং দাবি দাওয়ার প্রশ্নে সজাগ ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা উর্দু হওয়া উচিত।

উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে যাঁদেরকে কাঠ কাটা এবং পানি বইবার ভারবাহী জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তারাই ছিলেন বাংলার মুসলমান সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি। বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক চিত্র আরো করুণ। শহর কোলকাতার বাঙালি হিন্দুচিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, বলতে গেলে মুসলমান সমাজকে তা স্পর্শই করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাসসমূহ রচনা করেছিলেন, রাষ্ট্র সমাজ ইত্যাকার বিষয় নিয়ে চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেই সময়ে কোলকাতায় মুসলমানেরা বড়োজোর চিৎপুর রোডের সোনাউল্লার মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা গুলে বাকাগলির কিসসা কিংবা আমির হামজার পুঁথি শোনায় মশগুল। অথবা মিলাদ শুনে পীরের দরবারে ধরনা দিয়ে পূণ্য সঞ্চয়ে রত। মিলাদ, উরস, পুঁথিপাঠ,

ঘটা করে খানা, মেজবানীর এন্তেজাম এই সবের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিচর্চা সীমাবদ্ধ। সামর্থ্যের সীমাহীন দীনতা এবং আচার সংস্কারের সহস্র রকম বেড়াজাল মুসলমান সমাজকে কপাট জানালাহীন অচলায়তনে পরিণত করেছে। মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ জীবন জীবিকার তাড়নায় লাঙ্গলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওপরের দিকে তাকানোর কোনো সাহস তার নেই। এই রকমের একটা পরিস্থিতিতে মীর মোশাররফ হোসেনের মতো একজন শক্তিধর লেখক যে মুসলমান সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন, তাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। মীর মোশাররফ হোসেনের মানস জগত, সাধারণ মুসলমানদের মানস জগতের চাইতে খুব বেশি আলাদা নয়। কিন্তু তাঁর অনুভব করার মন ছিলো, প্রকাশ করার ভাষা তিনি রপ্ত করেছিলেন। আর ইন্দ্রিয়গুলো ছিলো অতি মাত্রায় সজাগ এবং জ্ঞান শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মীরের প্রধান রচনা বিষাদসিন্ধু প্রকৃত প্রস্তাবে শহীদে কারবালা পুঁথিরই আধুনিক রূপায়ণ। সেখানে জীবন জগতের নতুন জিগগাসা মীর চারিয়ে তুলতে পারেননি। তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহে মীর সহজাত প্রকাশ ক্ষমতা বলে সমাজ বাস্তবতার চিত্র গাঢ় রঙে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মীরের রচনায় সর্বপ্রধান গুণ প্রকাশভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ততা। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মীর মোশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না। একজন মুসলমান লেখকের একজন হিন্দু লেখকের কাছ থেকে পাওয়া এটাই হলো শ্রেষ্ঠ শিরোপা।

উনবিংশ শতাব্দীতে শহর কোলকাতায় যে একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, যে শ্রেণী আকাশের নক্ষত্রের মতো অনেক উজ্জ্বল দীপ্তিমান মনীষী পুরুষের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, তার মধ্যে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ একেবারেই নেই বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের সমগ্র জাগরণ ক্ষেত্রটাই ছিলো হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ কেন্দ্রিক। যদিও বাঙালি মুসলমানেরা সারা বাংলা প্রদেশে সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দুদের চাইতে বেশি না হলেও অন্ততঃ সংখ্যায় অর্ধেক। হিন্দু সমাজের তরুণরা পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলছেন। প্রতিভাবলে তরুণেরা খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করছেন। তাঁরাই প্রাচীন হিন্দুধর্ম নতুন করে গঠন করেছেন, হিন্দু ধর্মের সংস্কারে লাগছেন। তারাই নতুন বিত্তের মালিক হচ্ছেন, তাঁরাই বড়ো বড়ো চাকুরিগুলো করতলগত করছেন, তারাই নিলামে জমিদারী খরিদ করছেন। এই ফুটন্ত জাগ্রত হিন্দু সমাজের পাশে মুসলমান সমাজের উপস্থিতি একান্তই দীন, মলিন এবং করুণ। নতুন ভাবাদর্শে বলীয়ান হিন্দু সমাজের প্রতিভাবান মানুষেরা নতুনতরো সমাজের কথা চিন্তা করছেন, কেউ কেউ নাস্তিকতার প্রচার করছেন, কেউ আবার মাতৃভূমির ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সুন্দর চিত্রপট নির্মাণ করছেন। কিন্তু সবকিছু ঘটছে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের পাটাতনে, কোনো কিছু মুসলমান সমাজকে স্পর্শই

করছে। এমনকি তাঁরা যখন সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতাও করছেন, তাও তাদেরকে পার্শ্ববর্তী সমাজের জনগোষ্ঠীর মাঝে টেনে আনছে না।

উনবিংশ শতাব্দীতেই আধুনিক ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তার বীজতলাটি ছিলো সম্পূর্ণরূপে হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে সংস্থাপিত। বৃহত্তরো হিন্দু সমাজের ভেতরে তাঁদের পরিচয় আস্তিক, নাস্তিক, গোঁড়া কিংবা নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম অথবা নবদীক্ষিত খ্রীস্টান যাই হোক না কেনো, এই অংশের বাইরে তাঁদের কর্মকাণ্ডের এবং চিন্তা চেতনায় পরিধি বিস্তারিত হতে পারেনি। ব্যক্তিগত বিশ্বাসে তাঁরা যতোই সংস্কারমুক্ত এবং উদার হোন না কেনো সামগ্রিক বাঙালি সমাজের প্রেক্ষিতে তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই গৌণ একথা স্বীকার করতে হবে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি বিবেকানন্দ এই সকল মহীরুহ পুরুষ সকলের উত্থান ঘটেছে হিন্দু বীজতলাটি থেকে। তাঁদের সকলের ক্ষেত্র এক নয়। একজনের সঙ্গে আরেক জনের মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তথাপি তাঁদের চিন্তা চেতনা আবর্তিত হচ্ছে হিন্দু সমাজকে ঘিরেই। এমনকি যখন তাঁরা বিশ্বজনীন মতবাদ প্রচার করেছেন, তখনো তার ভারকেন্দ্রটি ধারণ করে আছে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ পাটাতন। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রের লক্ষণ বিচার এইভাবে যদি করা হয় আশা করি অন্যায় হবে না। রামমোহন রায় ছিলেন নতুন পুরাতনের সঙ্গে সেতুবন্ধ, সবচাইতে পরমত সহিষ্ণু উদার এবং নিবেদিত প্রাণ, আধুনিক চিন্তা ধারার প্রবক্তা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান চারিত্র্যলক্ষণ মানবকল্যাণে সংস্কারক এবং বাংলা ভাষা বিকাশের প্রতি অঙ্গীকার শিক্ষা বিস্তার এসবের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরম হংস ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্ম চিন্তার সার্থক প্রতিনিধি। মধুসূদন দত্ত সর্বঅর্থে ছিলেন বিদ্রোহী এবং ডিরোজিয়োর যথার্থ উত্তর সাধক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নব জাগ্রত ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দুখাতে বইয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মমতের সঙ্গে খ্রীস্টিয় মতের সংশ্লেষ ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস শিল্পের সার্থক স্থপতি এবং আধুনিক হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন কবি এবং মনীষী। তাঁর একক সাধনা বলেই বাংলা ভাষা রাতারতি প্রাদেশিকতার স্তর অতিক্রম করে বিশ্ব পরিসরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। বিবেকানন্দ হিন্দু সভ্যতা এবং সাংস্কৃতির মর্মবাণী ইউরোপ আমেরিকায় প্রচার করেছেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। আরো অনেক ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা যেতো, কিন্তু আমাদের একই উপসংহারে ফিরে আসতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই যে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান তার দুটি প্রান্ত। এক প্রান্ত স্পর্শ করেছে হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ। আরেক প্রান্ত বিকশিত করে তুলছে আধুনিক সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সংস্কৃতিচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোনো জল

অচল কক্ষ না থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলার প্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিলো। বৃটিশের উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই এই আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিলো বলেই তার বিকাশ বিকলাঙ্গ এবং একপেশে হয়েছিলো। মুসলমান সমাজ এই আধুনিকতার প্রতি যেমন মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনি, তেমনি তা হিন্দুদের মতো করে গ্রহণও করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তায় অভিঘাতে আরেকটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস মুসলিম সমাজের ভেতর থেকে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিলো। তার ফল এই হয়েছে যে বাংলদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বাংলা তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট দু'প্রান্তের দু'টো অঞ্চল মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সিকি শতাব্দীর অবসান না হতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভাবিত করে তোলে। জন্মের পর থেকেই এই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এক দোলাচল মানসিকতার মধ্য দিয়েই সময় অতিবাহিত করতে হচ্ছে। অনেক সময় তার প্রকোপ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর তা অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নে জাতির মধ্যে দ্বিধা বিভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তথা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট তার রাষ্ট্রসত্তার ভবিষ্যত অন্ধকারে আবৃত্ত করে রাখে। বর্তমান বাংলাদেশ এক সময় অবিভক্ত বাংলাদেশের অংশ ছিলো। আবার পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। ব্যক্তির মতো জনগোষ্ঠীও অতীতের টান অগ্রাহ্য করতে পারে না। ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সংকটসমূহের একটা হলো ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন রচনা করা। অদ্যাবধি বাংলাদেশের কৃত্যবিদ্য শ্রেণীর লোকেরা সে পথে বেশিদূর এগিয়েছেন সে কথা কিছুতেই বলা যাবে না।

ঘোষণা দিলেই একটা রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। একটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশ কিছুতেই এক লাফে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে পারে না। সে একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আমি, 'শুরু করতে হবে', এই বাক্যটি জোর দিয়ে উচ্চারণ করছি। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগণ্য প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের বিরাট একটি অংশ বাঙালিয়ানার নামে সে সব চিন্তা চেতনা প্রচার করে আসছেন, তার বেশিরভাগই পশ্চিম বাংলা কোলকাতা কেন্দ্রিক চিন্তাচর্চার চর্বিত চর্বন। মুসলিম প্রধান একটি সমাজে বাঙালিয়ানার প্রচার ঘটাতে হলে বাঙালিয়ানার একটা নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করতে হবে। এই সংজ্ঞা নির্মাণ পদ্ধতিতে দু'টো বিষয় অবশ্যই সমান গুরুত্বে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। প্রথমতঃ ধর্মশাসিত বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মতান্ত্রিক সামন্ত চিন্তার একচ্ছত্র প্রতাপের অবসান ঘটাতে হবে। যে জাড্যতা, যে বদ্ধমত, যে কূর্মবৃত্তি এই

সমাজমানসকে সঙ্কুচিত, অসহিষ্ণুতার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া করা না হলে, বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক বিশ্বের সামনে নির্ভয় চিত্তে কখনো দাঁড়াতে পারবে না। বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়া আরো নানা সম্প্রদায় রয়েছে। তথাপি মুসলমান সমাজের কথা বললাম একারণে যে তারা সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ স্বেচ্ছায় যদি নিজেদের মানস পরিবর্তনের পথটি অনুসরণ না করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠে না। বাঙালি মুসলমানের মানস ভুবনের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে মধ্যযুগ এখনো রাজ্যপাট বিস্তার করে আছে। মধ্যযুগীয় মানস পরিমণ্ডলে আধুনিক যুগের আলো বিকিরণ করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি মুসলমান নিজের ভারেই নুইয়ে আছে।

সাম্প্রতিক কালের বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের দ্বিতীয় শর্তটি হলো উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির যে পাটাতনটি সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটি গ্রহণযোগ্য মাণদণ্ড আবিষ্কার করা। বাঙালি সমাজের নানামুখী জাগরণের এই স্তরটি অবহেলা করা যেমন আমাদের সম্ভব হবে না, তেমনি নির্বিচারে গ্রহণ করাও উচিত হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তের জাগরণের সমস্ত বীজতলাটাই ছিলো হিন্দু সমাজের অধিকারে। বাঙালি সাংস্কৃতিতে এই শ্রেণীটি অনেক উৎকৃষ্ট কিছু সংযোজন করেছেন, কিন্তু পাশাপাশি তাঁদের সম্প্রদায়গত প্রবণতাসমূহও চারিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে মধ্যশ্রেণীভূক্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রতি এমন এক ধরনের মোহমুগ্ধতা ক্রিয়াশীল, সেটাকে অনেকটা অন্ধত্বের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই অসঙ্গত অতীতমুখীতা তাঁদেরকে বর্তমানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য বিমুখ করে রেখেছে। মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে অনেকগুলো সংস্কার এবং সামাজিক আন্দোলনের উত্থিত হওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, সমাজ সংগঠনের মধ্যে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্র পুরোনো মূল্যচিন্তার স্তরে একগুচ্ছ নতুন মূল্যচিন্তা সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করা কখনো সম্ভব হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রেক্ষিতটা ভেঙ্গে ফেলে বাঙালিত্বের সম্পূর্ণ একটা নতুন প্রেক্ষিত নির্মাণ করা প্রয়োজন। ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষদের হাতে বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। এই প্রস্তাবিত নতুন সাংস্কৃতিক পাটাতন সমস্ত বাঙালি জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া, এবং সুস্থ বিনিময়ের পথ অনেকখানিই সম্প্রসারিত করবে।